মাধ্যমিক

বাংলা সহপাঠ

নবম-দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

মাধ্যমিক বাংলা সহপাঠ

(উপন্যাস ও নাটক)

নবম-দশম শ্রেণি

লেখক ও সংকলক

অধ্যাপক ড. রফিকউল্লাহ্ খান
অধ্যাপক নূরজাহান বেগম
অধ্যাপক ড. মাসুদুজ্জামান
অধ্যাপক শ্যামলী আকবর
অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর
ড. শোয়াইব জিবরান

সম্পাদক

অধ্যাপক আবদুল্লাহ্ আবু সায়ীদ
অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০১২

পুনর্মুদ্রণ : জুলাই, ২০১৭

পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৮

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক । পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প-২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

নবম-দশম শ্রেণির মাধ্যমিক বাংলা সহপাঠ শীর্ষক পাঠ্যপুস্তকটি নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে। পাঠপুস্তকটিতে উপন্যাস ও নাটক এমনভাবে নির্বাচন করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা সাহিত্যের দুই বিশেষ শাখা (উপন্যাস ও নাটক) সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করতে পারে এবং তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হয়। পাঠ্যপুস্তকটির আরও সমৃদ্ধিসাধনের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের বিপুল কর্মযজ্ঞের মধ্যে অতি স্বল্প সময়ে পুস্তকটি রচিত হয়েছে, ফলে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণগুলোতে পাঠ্যপুস্তকটিকে আরও সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
উপন্যাস :	
ক. ভূমিকা	১
খ. কাকতাড়ুয়া (মূলপাঠ)	৯
গ. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও সৃজনশীল প্রশ্ন	৩২
নাটক :	
ক. ভূমিকা	৩৫
খ. বহিপীর (মূলপাঠ)	৪১
গ. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও সৃজনশীল প্রশ্ন	৬৬

উপন্যাস : ভূমিকা

ক. উপন্যাসের ধারণা ও সংজ্ঞা

উপন্যাস গদ্যে লেখা একধরনের গল্প। মানুষ গল্প বলতে ভালোবাসে। সুপ্রাচীনকাল থেকেই এটা চলে আসছে। মানুষ তখন মুখে মুখে গল্প বলত। লিখে রাখার চল ছিল না। পরে এরই ধারাবাহিকতায় আবির্ভাব ঘটে উপন্যাসের। তবে উপন্যাস শুধু চোখে দেখা গল্প নয়, এ হচ্ছে একধরনের সৃষ্টিশীল রচনা। মানুষের জীবনই হচ্ছে উপন্যাসের উৎস। এই জীবনে যেসব ঘটনা ঘটে, সেই সব ঘটনার সঙ্গে লেখকেরা নিজের ভাবনা, কল্পনাকে মিশিয়ে দিয়ে রচনা করেন উপন্যাস। উপন্যাসে তাই আমরা পাই ঔপন্যাসিকের জীবনানুভূতির প্রকাশ। এভাবেই উপন্যাস হয়ে উঠেছে একধরনের সৃষ্টিশীল রচনা। মানুষ এরপর যখন লিখে রাখতে শেখে, তখনই আবির্ভাব ঘটে উপন্যাসের। পনেরো শতকে ছাপাখানার আবির্ভাবের পর বিলুপ্তি ঘটে গল্পকথকদের। শুরু হয় আধুনিক উপন্যাসের কাল। প্রথমে এই আধুনিক উপন্যাসের সূত্রপাত ঘটে ইউরোপে, পরে তা ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে। শুরু হয় আধুনিক উপন্যাস লেখা।

শুরুতেই বলেছি, উপন্যাসে থাকে একটি প্রধান বা মূল গল্প। এই গল্পটিকে গড়ে তোলার জন্যে থাকতে পারে আরও কিছু পার্শ্বগল্প। ফলে, উপন্যাসের আকার সাধারণত ছোট হয় না, আবার এটি নিতান্ত ছোট গল্পও নয়। তবে এর আকার কতটুকু হবে, মূল গল্পটি গড়ে তুলতে গিয়ে পার্শ্বগল্পের আশ্রয় নেওয়া হবে কি না, এ বিষয়ে সাহিত্য তাত্ত্বিকগণ একমত হতে পারেন নি। ই. এম. ফস্টার তাঁর *আসপেক্টস্ অব দ্য নভেল* গ্রন্থে বলেছেন, উপন্যাস হচ্ছে 'সুনির্দিষ্ট আয়তনের গদ্যকাহিনি' (prose of a certain extent)। এই আয়তনের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, উপন্যাসের শব্দসংখ্যা কমপক্ষে পঁচিশ হাজার হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে এর সর্বোচ্চ সংখ্যা কত হবে, ফস্টার সে সম্পর্কে কিছু বলেন নি। প্রখ্যাত ফরাসি ঔপন্যাসিক মার্সেল প্রুস্তের লেখা একটি উপন্যাসের (In Search of Lost Time) শব্দসংখ্যা বারো লাখের মতো। এটিই এ পর্যন্ত লেখা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় উপন্যাস। লেভ তলস্তয়ের *ওয়ার অ্যান্ড পিসের* শব্দসংখ্যাও অনেক– পাঁচ লাখ সাতাশি হাজারের মতো। ইতালির বিখ্যাত নন্দনতাত্ত্বিক ও ঔপন্যাসিক উমবার্তো একো আবার সাত শব্দের এক বাক্যে রচিত একটি লেখাকে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম উপন্যাস বলে দাবি করেছেন। শুধু আকার নয়, উপন্যাসের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও সাহিত্য তাত্ত্বিকগণ একমত হতে পারেন নি। এর কাহিনি কীভাবে উপস্থাপন করা হবে, কাহিনির বিষয়-আশয় কী হবে, ভাষারীতির ধরন কেমন হবে– এসব বিষয়ে সাহিত্য তাত্ত্বিকগণ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের জন্য আলাদা আলাদা পথ বেছে নিয়েছেন।

তবে এসব পার্থক্য সত্ত্বেও কিছু কিছু বিষয়ে যে মিল নেই, এমন নয়। এমন সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণেই উপন্যাস বিশেষ একধরনের সৃষ্টিশীল রচনা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে। যেমন, ঔপন্যাসিক যে গল্পটি নির্মাণ করেন, সেটি নির্মাণ করা হয় বর্ণনার সাহায্যে। গদ্য আর সংলাপের মাধ্যমে। উপন্যাসের এই বর্ণনাকে বলে 'ন্যারেটিভ' (Narrative)। সুবিন্যস্তভাবে এর কাহিনিকে উপন্যাসে তুলে ধরা হয়। বাংলায় ব্যবহৃত 'উপন্যাস' শব্দটির মধ্যেও এই বিন্যাসের কথা আছে। 'উপ' উপসর্গের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'ন্যাস'। এই ন্যাসই হচ্ছে বিন্যাস। বাংলায় ব্যবহৃত এই শব্দটির সংস্কৃত ব্যুৎপত্তি হচ্ছে এ রকম : উপ+নি+অস+অ = উপন্যাস। ইংরেজিতে এর দুটি প্রতিশব্দ আছে : Novel, Fiction। নভেল শব্দটি এসেছে ইতালির novella থেকে। এর অর্থ : ale (গল্প) বা কাহিনি। ফিকশনের উৎস হচ্ছে fact (ঘটনা) বা গল্প।

উপন্যাসের কয়েকটি সংজ্ঞা

সাহিত্যের বিশেষ রূপ হিসেবে উপন্যাসের সংজ্ঞা দেওয়া খুব সহজ নয়। এর আকার আর প্রকৃতি নিয়ে আছে ভিন্নমত। ফলে এর সুনির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। তবু এর সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে উপন্যাসের যেসব সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেগুলো এ রকম :

> গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত জীবন-দর্শন ও জীবনানুভূতি কোনো বাস্তব কাহিনি অবলম্বন করিয়া যে বর্ণনাত্মক শিল্পকর্মে রূপায়িত হয়, তাহাকে উপন্যাস কহে।
> ['উপন্যাস', *সাহিত্য-সন্দর্শন*, শ্রীশচন্দ্র দাস, কথাকলি, ঢাকা, ১৯৭৬।]
>
> ইংরেজিতে 'নভেল' এক বিশেষ ধরনের সাহিত্য-সংরূপ। গদ্যে লেখা সুদীর্ঘ বর্ণনাত্মক সাহিত্যকর্ম।
> ['উপন্যাস', *সাহিত্য শব্দার্থকোষ*, সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ২৯।]
>
> An invented prose narrative of considerable length and a certain complexity that deals imaginatively with human experience, usually through a connected sequence of events involving a group of persons in a specific setting, is called a novel.
> [*The Britannica Guide to Literary Elements: Prose Literary Terms and Conc*epts, Ed. by Kathleen Kuiper, Britannica Educational Publishing, New York, 2012, p. 1.]
>
> The term "novel" is now applied to a great variety of writings that have in common only the attribute of being extended works of *fiction* written in prose.
> ['Novel', *A Glossary of Literary Terms* (9th. Edition), M. H. Abrams and Geoffrey Galt Harpham, Wadsworth Cengage Learning, Boston, 2009, p. 226.]

সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, উপন্যাস হচ্ছে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের সৃষ্টি। সাহিত্যের আদিরূপ হিসেবে প্রথমে সৃষ্টি হয়েছিল কবিতা, মহাকাব্য, আখ্যানকাব্য। পরে মানুষের জীবন জটিল হয়ে উঠতে থাকলে আবির্ভাব ঘটে উপন্যাসের। নিজের কথা, চারপাশের মানুষের কথা, সমাজের কথা বলার তাগিদ থেকেই কাহিনির আশ্রয় নেন লেখকেরা। রচনা করতে থাকেন উপন্যাস। উপন্যাসে তাই লেখকের জীবনদর্শন ও জীবনবোধের প্রকাশ লক্ষ করি আমরা। জীবনের সমগ্রতাই প্রতিফলিত হয় উপন্যাসে। এটাই হচ্ছে উপন্যাসের মর্মকথা। সতেরো শতকের হিস্পানি ঔপন্যাসিক সার্ভেন্তাসের *ডন কিহোতো* থেকে আধুনিককালের এই বোধেই পৌঁছেছেন ঔপন্যাসিকেরা।

খ. উপন্যাসের আঙ্গিক ও গঠনকৌশল

উপন্যাসের কাহিনি কীভাবে গড়ে তোলা হবে, সেটাই হচ্ছে উপন্যাসের আঙ্গিক ও গঠনকৌশলের দিক। প্রায় চার শত বছর ধরে নানা চর্চার মধ্য দিয়ে সাধারণভাবে উপন্যাস যেসব উপাদানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে সেগুলো নিম্নরূপ:

১. কাহিনি বা আখ্যানভাগ (plot)
২. চরিত্র (character)
৩. দৃশ্য/পরিবেশ (scene or setting)
৪. বর্ণনাভঙ্গি (narrative method),
৫. ভাষা (diction) এবং
৬. ঔপন্যাসিকের জীবনভাবনা (Author's philosophy)।

উপন্যাসের প্রধান উপাদান এর কাহিনি বা গল্প। এই কাহিনি হতে পারে, সরল আবার জটিল। নিরীক্ষাধর্মী উপন্যাসে দেখা যায়, গল্পের প্রাধান্য তেমন থাকে না। ভাষা বা বলার ভঙ্গিটাই প্রধান হয়ে ওঠে। অ্যাবসার্ড উপন্যাস কিংবা ফরাসি নব্য (nouveau) উপন্যাস এভাবেই লেখা হয়েছে। তবে সাধারণভাবে কতগুলো ছোট ছোট বা উপকাহিনির সাহায্যে উপন্যাসের কাহিনি গড়ে তোলা হয়। উপন্যাসে উপস্থাপিত এই কাহিনিকে বলা হয় আখ্যানভাগ (plot) বা কাহিনি-সমগ্র।

উপন্যাসের দ্বিতীয় উপাদান চরিত্র। চরিত্রের আচার-আচরণ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে উপন্যাস। উপন্যাসে এক বা একাধিক চরিত্র থাকে। এর কোনটি হবে প্রধান চরিত্র, বা আদৌ কোনো প্রধান চরিত্র থাকবে কি না, সেসব নির্ভর করে ঔপন্যাসিকের ওপর। চরিত্রগুলো যেসব ঘটনা ঘটায় তার মধ্য দিয়েই উপন্যাসের কাহিনি অগ্রসর হতে থাকে। চরিত্রের বিকাশের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের কাহিনিও বিকশিত হয়। উপন্যাস পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। উপন্যাস হচ্ছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই ক্রমবিকশিত চরিত্রেরই কাহিনি।

উপন্যাসের আরেকটি উপাদান হচ্ছে এর নানান দৃশ্য বা পরিবেশ। বিভিন্ন টুকরো টুকরো দৃশ্য বা পরিবেশের সমন্বয়েই উপন্যাসের কাহিনিকে গেঁথে তোলেন ঔপন্যাসিক। চরিত্রের মনোভাব এবং আচার-আচরণের গতিপ্রকৃতির ওপর নির্ভর করেই গড়ে ওঠে এই পরিবেশ। বর্ণনারীতি হচ্ছে উপন্যাসের আরেকটি উপাদান। উপন্যাসে আমরা যে দৃশ্য, পরিবেশ বা কাহিনির কথা পাই তা বিভিন্ন ভঙ্গির সাহায্যে নির্মাণ করা হয়। কোথাও চরিত্র নিজের ভাষায় নিজের গল্প বলে, কোথাও ঔপন্যাসিক উপন্যাসের কাহিনি বর্ণনা করেন। কোথাও থাকে শুধুই তথ্য, কোথাও ঔপন্যাসিক আবেগময় কাব্যিক ভাষায় কাহিনির কাঠামো গড়ে তোলেন। সেদিক থেকে দেখলে ভাষা হচ্ছে উপন্যাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কেননা, উপন্যাস লেখা হয় ভাষার মাধ্যমে। ভাষা দিয়েই বর্ণনা করা হয় সবকিছু। সৃষ্টি করা হয় বিশেষ বিশেষ পরিবেশ। যথাযথ স্থানে যথার্থ ভাষার ব্যবহার না থাকলে উপন্যাস হয়ে ওঠে না। তবে উপন্যাসের সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করে লেখকের জীবনভাবনা বা জীবনদর্শন। লেখকের বলা কথাটিই হচ্ছে তাঁর জীবনদর্শন। শেষ পর্যন্ত আমরা একটি উপন্যাসের কাহিনিতে এই জীবনদর্শনই প্রতিফলিত হতে দেখি। সামগ্রিকভাবে বললে, উল্লিখিত সবগুলো উপাদান মিলিয়েই লেখা হয় উপন্যাস।

গ. বাংলা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আগেই বলেছি, উপন্যাস আধুনিক কালের সৃষ্টি। বাংলা সাহিত্যে মাত্র দেড় শত বছর আগে ইংরেজি উপন্যাসের আদলে উপন্যাস রচনার সূত্রপাত ঘটে। তবে অনেকেই এর বীজ খুঁজে পেয়েছেন প্রাচীন সংস্কৃত কাহিনি-কাব্য, পঞ্চতন্ত্র ও বৌদ্ধ জাতকের গল্প, মধ্যযুগের রূপকথা, ময়মনসিংহ গীতিকা, রোমান্টিক কাহিনি-কাব্য, নাথ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, আরব্য উপন্যাস, লোকগাথা প্রভৃতি রচনায়। এভাবে দেখলে, আধুনিক কালের পূর্বে বাংলা উপন্যাসের কোনো নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাত ঘটলে কলকাতাকে কেন্দ্র করে একদিকে ব্যাপক নগরায়ণ, অন্যদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে। ইউরোপীয় শিক্ষার প্রভাবে মানবিকতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, শিক্ষা ও সাময়িক পত্রের প্রসার, সমাজ সচেতনতা ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের দ্বারা সমাজ ক্রমশ জটিল হয়ে পড়ে। নতুন কালের মানুষ নতুন সমাজের কথা প্রকাশের গরজ অনুভব করতে থাকে। এরই প্রভাবে উদ্ভব ঘটে উপন্যাসের।

অনেকে মনে করেন, হানা ক্যাথারিন মুলেন্সের (১৮২৬-৬১) লেখা *ফুলমনি ও করুণার বিবরণ* (১৮৫২) হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। কেউ কেউ আবার প্যারীচাঁদ মিত্রের *আলালের ঘরের দুলাল* (১৮৫৮) এর মধ্যে উপন্যাসের লক্ষণ খুঁজে পেয়েছেন। তবে সবাই মেনে নিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-৯৪) *দুর্গেশ নন্দিনী* (১৮৬৫) হচ্ছে

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বাংলা উপন্যাসের স্রষ্টা। উপন্যাসের সমস্ত লক্ষণ তাঁর উপন্যাসে দেখা যাবে। তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন। লিখেছেন সামাজিক উপন্যাস। সমাজের নানা অসংগতি, ব্যক্তির কামনা, বাসনা, বেদনা ও দ্বন্দ্বের কথা চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর উপন্যাসে। কাহিনি বর্ণনা, চরিত্রচিত্রণ, ভাষা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও তিনি সাফল্য দেখিয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হচ্ছে *কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল* ইত্যাদি।

বাংলা উপন্যাসের আরেক কীর্তিমান লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। উপন্যাস রচনাতেও তাঁর সাফল্য ঈর্ষণীয়। ব্যক্তির মন ও মননের অপূর্ব সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসগুলো রচনা করেছেন। বঙ্কিমের উপন্যাসে আমরা দেখেছি সমাজের চাপে ব্যক্তি আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। তাঁর চরিত্রগুলো সীমাহীন দুর্ভোগের শিকার হয়েছে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে পাওয়া গেল নতুন কালের নারী ও পুরুষকে। মানবিকতার দ্বারা দীক্ষিত হয়ে তারা সামাজিক সংস্কারকে অস্বীকার করছে। নারী-পুরুষের সমানাধিকারের ভিত্তিতে অর্জন করতে চাইছে আত্মপ্রতিষ্ঠা। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে চাইছে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান। কাহিনি নির্মাণ, চরিত্র চিত্রণ, ভাষার নিরীক্ষা, যুগের প্রতিফলন, মনোবিশ্লেষণ ইত্যাদি দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলো উল্লেখযোগ্য। তাঁর লেখা বহুল আলোচিত উপন্যাসগুলো হচ্ছে *চোখের বালি, গোরা, ঘরে বাইরে, চার অধ্যায়* ও *যোগাযোগ*।

রবীন্দ্রনাথের পরে বাঙালির গৃহকাতরতা এবং আবহমান পারিবারিক আবেগের ওপর ভর করে উপন্যাস লিখেছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)। অর্জন করেছিলেন ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হচ্ছে *চরিত্রহীন, গৃহদাহ, দেবদাস, দেনা-পাওনা, শ্রীকান্ত* ইত্যাদি।

বাংলা উপন্যাসের জগতে এরপর আবির্ভাব ঘটে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের– তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬)। আবহমান বাংলার প্রাকৃতিক মাধুর্য, পল্লির স্নিগ্ধ শান্ত রূপ, অরণ্য, পাহাড় যে এখনো আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাঁর লেখা পথের পাঁচালী, অপরাজিতা, আরণ্যক ইত্যাদি উপন্যাস পড়লেই তা বোঝা যায়। তারাশঙ্করের উপন্যাসে পাই অতীতের গৌরব আর ঐশ্বর্য হারানো জমিদার, নিম্নশ্রেণির বিচিত্র পেশার সাধারণ মানুষের কথা। এই মানুষজন আমাদের চিরচেনা বৈষ্ণবী, কবিয়াল, যাত্রাশিল্পী, মৃৎশিল্পী, বেদে, সাপুড়ে, বাজিকর, ঝুমুর দলের নাচিয়ে ইত্যাদি। উঠতি শিল্পমালিক আর শ্রমিকদের জীবনের ছবিও পাওয়া যাবে তাঁর উপন্যাসে। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হচ্ছে– *গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, ধাত্রীদেবতা, হাসুলী বাঁকের উপকথা, কবি* প্রভৃতি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : (১) মার্কসবাদের পটভূমিতে ধনী-দরিদ্রের দ্বন্দ্ব এবং (২) ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের আলোকে নর-নারীর জটিল সম্পর্ককে তিনি উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। ঔপনিবেশিক শাসনের দ্বারা জর্জরিত মানুষের জীবনের ছবি তাঁর উপন্যাসে উজ্জ্বল। সেই সঙ্গে পাওয়া যাবে গ্রামীণ বাস্তবতার চিত্র। *দিবারাত্রির কাব্য, পদ্মানদীর মাঝি, পুতুল নাচের ইতিকথা,* চিহ্ন, *শহরতলী* প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। বাংলা উপন্যাস আরও যাঁরা লিখে খ্যাতিমান হয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন : জগদীশ গুপ্ত, সতীনাথ ভাদুড়ী, কমলকুমার মজুমদার, দেবেশ রায়, মহাশ্বেতা দেবী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

ঘ. বাংলাদেশের উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১৯৪৭ সালে রাজনৈতিকভাবে ভারত বিভক্ত হয়ে যায়। পূর্ব বাংলায় সূচনা ঘটে নতুন এক সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার। এই সময়েই যাত্রা শুরু হয় বাংলাদেশের উপন্যাসের। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই অঞ্চলটি ছিল পাকিস্তানের উপনিবেশ। ঢাকাকে কেন্দ্র করে নাগরিক জীবনের আবির্ভাব ঘটলেও গ্রামীণ জীবন

ছিল একই রকম। ধনী-দরিদ্রের দ্বন্দ্ব, গ্রামীণ কুসংস্কার, দারিদ্র্য ইত্যাদির দ্বারা বিপন্ন হয়ে পড়েছিল মানুষের জীবন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ অর্জন করে স্বাধীনতা। জাতীয় জীবনে দেখা দেয় নতুন উদ্দীপনা। জনজীবনে আধুনিকতার ছোঁয়া যেমন লাগে, তেমনি গ্রামীণ জীবনের টানও ছিল সমান। এই পটভূমিতে বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকেরা লিখেছেন নানা ধরনের উপন্যাস। শ্রেণিকরণ করলে বাংলাদেশের উপন্যাসকে এভাবে বিন্যস্ত করা যেতে পারে :

(১) গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত উপন্যাস : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *লালসালু*, *কাঁদো নদী কাঁদো*, *চাঁদের অমাবস্যা*, আবু ইসহাকের *সূর্য-দীঘল বাড়ি*, জহির রায়হানের *হাজার বছর ধরে*, আবদুল গাফফার চৌধুরীর *চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান*, শওকত ওসমানের *জননী*, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *খোয়াবনামা*, হাসান আজিজুল হকের *আগুনপাখি*, সৈয়দ শামসুল হকের *মহাশূন্যে পরান মাস্টার*, সেলিনা হোসেনের *দীপান্বিতা* ইত্যাদি।

(২) নগর ও গ্রামের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস : আলাউদ্দিন আল আজাদের ক্ষুধা ও আশা, শহীদুল্লাহ্‌ কায়সারের সংশপ্তক, সরদার জয়েন উদ্দিনের অনেক সূর্যের আশা, আবুল ফজলের রাঙাপ্রভাত, আনোয়ার পাশার নীড় সন্ধানী ইত্যাদি।

(৩) নগর জীবনের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস : আবুল ফজলের *জীবন পথের যাত্রী*, রশীদ করীমের *উত্তম পুরুষ* ও *প্রেম একটি লাল গোলাপ*, আবু রুশদের *সামনে নতুন দিন*, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *চিলেকোঠার সেপাই*, শওকত আলীর দক্ষিণায়নের দিন ইত্যাদি।

(৪) আঞ্চলিক ও বিশেষ জীবনধারার উপন্যাস : আলাউদ্দিন আল আজাদের *কর্ণফুলি*, শহীদুল্লাহ্‌ কায়সারের *সারেং বউ*, শামসুদ্দীন আবুল কালামের *কাশবনের কন্যা*, আবু ইসহাকের *পদ্মার পলি* সরদার জয়েনউদ্দিনের *পান্নামতি*, শওকত আলীর *প্রদোষে প্রাকৃতজন*, সেলিনা হোসেনের *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* ইত্যাদি।

(৫) মনস্তত্ত্ব ও দার্শনিক উপন্যাস : আলাউদ্দিন আল আজাদের *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*, সৈয়দ শামসুল হকের *দেয়ালের দেশ* ও *এক মহিলার ছবি*, শওকত আলীর *পিঙ্গল আকাশ*, মাহমুদুল হকের *খেলাঘর* ইত্যাদি।

(৬) ঐতিহাসিক ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস : আবু জাফর শামসুদ্দিনের *ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান* ও *পদ্মা মেঘনা যমুনা*, শামসুদ্দীন আবুল কালামের *আলম গড়ের উপকথা*, সত্যেন সেনের *অভিশপ্ত নগরী*, আনোয়ার পাশার *রাইফেল রোটি আওরাত*, শওকত ওসমানের *জলাঙ্গী*, রিজিয়া রহমানের *বং থেকে বাংলা*, মাহমুদুল হকের *জীবন আমার বোন*, হাসান আজিজুল হকের *বিধবাদের কথা*, সেলিনা হোসেনের *হাঙর নদী গ্রেনেড* ও *গায়ত্রী সন্ধ্যা*, হুমায়ুন আহমেদের *আগুনের পরশমনি*, *জ্যোৎস্না ও জননীর গল্প*, *দেয়াল* ইত্যাদি।

এই বিভাজন ছাড়াও বয়সভেদে নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে উপন্যাস রচনা করেছেন বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকেরা। ফলে তাঁরা যেমন বড়দের জন্য উপন্যাস লিখেছেন, তেমনি লিখেছেন ছোটদের জন্যও।

সব মিলিয়ে বলা যায়, বিচিত্র ধারায় বাংলাদেশের উপন্যাস বিকশিত হয়েছে। গ্রামীণ মানুষের জীবন ও শহুরে জীবন, ব্যক্তিক সংগ্রাম ও জাতিগত সংগ্রাম, ইতিহাস ও রাজনীতি-সবকিছুই বাংলাদেশের উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। চরিত্রচিত্রণ, ভাষা, আখ্যানশৈলী ইত্যাদি নানা দিক থেকে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকেরা।

ঙ. কাকতাড়ুয়া উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক পরিচিতি : সেলিনা হোসেন

সেলিনা হোসেন ১৯৪৭ সালের ১৪ জুন রাজশাহীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোশাররফ হোসেন, মাতার নাম মরিয়মন্নেসা বকুল। তিনি পিতামাতার চতুর্থ সন্তান। ১৯৬০-এর দশকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে লেখালেখির সূচনা। এ পর্যন্ত বড়দের জন্য তাঁর প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা তেত্রিশ, ছোটদের পঁচিশ। সেলিনা হোসেনের লেখার জগৎ বাংলাদেশের মানুষ, তার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। তাঁর উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে সমকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংকটের সামগ্রিকতা। বাঙালির অহঙ্কার ভাষা-আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ তাঁর

২০১৫

লেখায় নতুন মাত্রা অর্জন করেছে। ইংরেজি, রুশ, ফরাসি, হিন্দি, জাপানি, কোরিয়ান, ফিনিশ, উর্দু, আরবি, মালে, মালায়লাম ইত্যাদি বেশ কয়েকটি ভাষায় তাঁর বেশ কিছু গল্প ও উপন্যাস অনূদিত হয়েছে। বিদেশি বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর উপন্যাস পাঠ্যসূচিভুক্ত হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হচ্ছে : *হাঙর নদী গ্রেনেড, পোকামাকড়ের ঘরবসতি, নীল ময়ূরের যৌবন, গায়ত্রী সন্ধ্যা, পূর্ণছবির মগ্নতা, যমুনা নদীর মুশায়েরা, ভূমি ও কুসুম*। একুশে পদক, বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারসহ পেয়েছেন দেশের প্রধান প্রধান সব পুরস্কার। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছেন *সুরমা চৌধুরী আন্তর্জাতিক স্মৃতি পুরস্কার* (ভারত)। ২০১০ কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডিলিট উপাধিতে ভূষিত করে। কর্মজীবনে তিনি বাংলা একাডেমির পরিচালক ছিলেন। এখন সার্বক্ষণিকভাবে লেখালেখি, নারী উন্নয়ন আর মানবাধিকার নিয়ে কাজ করছেন।

উপন্যাসের আলোচনা : *কাকতাড়ুয়া*

বাংলাদেশের কোনো একটি গ্রাম।এই গ্রামেরই এক কিশোর বুধা। এক চাচি আর চাচাতো বোন কুন্তি ছাড়া তিন কুলে আপন বলতে কেউ নেই। তবে আজ না থাকলেও একদিন ছিল। সে বছর দুয়েক আগের কথা। বাবা-মা ছাড়াও ছিল দুই বোন আর এক ভাই। সবচেয়ে ছোট বোন বিনুর বয়স ছিল দেড় বছর। ছিল পিঠাপিঠি এক ভাই তালেব আর বোন শিলু।এই ভাই-বোনদের নিয়ে ভালোই কাটছিল তার দিনগুলো।কিন্তু একরাতে সব শেষ হয়ে গেল। কলেরায় মারা গেল সবাই। ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেল বুধা। চাচির বাড়িতে প্রথমে আশ্রয় মিলেছিল। কিন্তু দারিদ্র্যের কথা তুললে বুধা সেই বাড়ি ত্যাগ করে। সেই থেকে বুধা একা। যখন যেখানে খুশি রাত কাটায়। যা খুশি তাই করে। যখন যা জোটে তাই দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে।

পুরো গ্রাম আর হাটবাজার হয়ে উঠল তার বিচরণক্ষেত্র। চেনাজানা সব মানুষ হয়ে উঠল তার আপনজন। এভাবে দিন যায়, দিন আসে। কিন্তু একদিন ঐ গ্রামে মিলিটারি ঢুকে পড়ল। পুড়িয়ে দিল বাজারের দোকানপাট। বিস্মিত বুধা, কেন মিলিটারিরা এমন করল? কী এমন অপরাধ করেছে বাংলাদেশের মানুষ? ভীষণ ক্ষুব্ধ হলো সে। ভাবল,এর প্রতিকার হওয়া দরকার। প্রতিশোধ নেওয়া দরকার। বুঝতে তার অসুবিধা হলো না,মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ কী, তা সে বোঝেই না। তবে এটা বুঝেছিল, ঐ মিলিটারিরা বিদেশি। বাংলাদেশের মানুষ নয়। এদের বিরুদ্ধে লড়াই করা জরুরি। শুধু এরা নয়, যারা এদের সহায়তা করছে, তাদের বিরুদ্ধেও লড়াই করতে হবে। অন্যদের মতো গ্রাম ছেড়ে সে পালিয়ে যাবে না। কিন্তু সে তো খুব ছোট, যুদ্ধ করবে কী করে?

এক রাতে মুক্তিযোদ্ধা আলি ও মিঠু রাতের আঁধারে গ্রামে এলো। বুধাকে বলল স্কুলের মিলিটারি ক্যাম্পটা উড়িয়ে দিতে হবে। মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো বুধা। প্রথমে পুড়িয়ে দিল শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আহাদ মুন্সির বাড়ি। তারপর রাজাকার কমান্ডারের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিল। বাপ-মা হারানো কিশোর বলে কেউ তাকে তেমন একটা সন্দেহ করল না। তারপর এলো সেই দিন। মুক্তিযোদ্ধাদের নেতা শিল্পী শাহাবুদ্দিন তাকে মাইন পেতে ক্যাম্পটা উড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দিলেন। বাঙ্কার খোঁড়বার সময় কৌশলে সে তার ভেতর মাইন পুঁতে চলে এলো নদীর ধারে। এখানেই অপেক্ষা করছিলেন শাহাবুদ্দিন এবং তাঁর সহযোদ্ধারা।এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ।পাকিস্তানি সেনারা বাঙ্কারে ঢুকতেই পুরো ক্যাম্পটা মাইনের বিস্ফোরণে উড়ে গেল। নদীতে নৌকায় বসে শাহাবুদ্দিন, বুধা শুনতে পেল সেই শব্দ। তাদের অভিযান সফল হলো। নৌকা সরে গেল নিরাপদ দূরত্বে। সংক্ষেপে এই হচ্ছে *কাকতাড়ুয়া* উপন্যাসের কাহিনী। এক সাহসী কিশোর মুক্তিযোদ্ধার কাহিনী।

আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না, উপন্যাসটি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত। এর আখ্যানভাগ বা প্লটটিকে চমৎকারভাবে গড়ে তুলেছেন সেলিনা হোসেন। শুরুটা এ রকম :

রাত পোহালে দিনের আলো, সুয্যি ডুবলে আঁধার। ওর কাছে দুটোই সমান। হাটে-মাঠে ঘুরে বেড়ায়। ঘুরতে ঘুরতে যে কোথায় যায় সে হিসেব রাখে না। ওর কাছে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সব সমান। মনে করে যেদিকে চোখ যায়, সেদিকেই ওর জন্যে রাস্তা খোলা।

এই হচ্ছে *কাকতাড়ুয়া* উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বুধার কথা। এরপর বুধার চরিত্রটিকে ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছেন সেলিনা হোসেন। বুধা কিশোর হলেও অসীম সাহস আর মানবিক গুণাবলির অধিকারী সে। দেশের মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, বিদেশি মিলিটারিদের প্রতি ঘৃণা, দেশাত্মবোধ তার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। খুবই স্বাভাবিক মনে হয় তার এই আচার-আচরণ। দেশকে ভালোবাসে বলে ধীরে ধীরে সে মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ওঠে। সব মিলিয়ে বলা যায়, দেশপ্রেমের এক অনবদ্য কাহিনী এটি। ঔপন্যাসিক এর চরিত্রগুলোকে, বিশেষ করে বুধার চরিত্রটি এ লক্ষ্যেই গড়ে তুলেছেন।

কাকতাড়ুয়া উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বুধা। বুধাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে এর কাহিনী। সে কিশোর কিন্তু ভীষণ সাহসী। ছেলেবেলায় সে ভয়ের গল্প শোনেনি। ভয় কী, তা-ই সে জানে না। বাবা-মা, ভাই-বোন মারা যাওয়ার কথা মনে হলে তার আর ভয় থাকে না। গাঁয়ের লোক তাকে পাগল বললেও সে আসলে এক 'সাহসী বালক'। একা একা বেড়ে উঠতে গিয়ে সে আরও সাহসী হয়ে ওঠে। চাচির বাড়ি ছেড়ে এলে তার মধ্যে মুক্তির বোধ জাগে। একা একা থাকতে থাকতে সে স্বাধীন মানুষ হিসেবে বড় হতে থাকে। ঔপন্যাসিক এভাবেই ভয়হীন এক কিশোর হিসেবে তাকে গড়ে তুলেছেন। এর পরই সে জড়িয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে। শান্তি কমিটি আর রাজাকার কমান্ডারের বাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। ক্যাম্পের বাঙ্কারে মাইন পেতে রেখে আসে। ভয় পায় না। বুধার এই যে সাহসী হয়ে বেড়ে ওঠা এবং তারপর মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়া— এই দিকটিকে সেলিনা হোসেন চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন এই উপন্যাসে। বুধার চরিত্রের এই বিকাশ তাই খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। কিশোর হিসেবে তার মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার বিষয়টি এভাবেই যৌক্তিক হয়ে উঠেছে।

কাকতাড়ুয়া উপন্যাসে আরও বেশ কয়েকটি চরিত্র আমরা পাই। তারা খুব বড় ভূমিকা পালন করেনি। তবে উপন্যাসের কাহিনী গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। এই চরিত্রগুলো হচ্ছে কুন্তি, নোলক বুয়া, হরিকাকু, আহাদ মুন্সি, আলি, মিঠু, ফুলকলি, রাজাকার কুদ্দুস ও মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী শাহাবুদ্দিন। এই চরিত্রগুলো ছাড়া আরও একজনের প্রভাব এই উপন্যাসে স্পষ্ট। সেই মানুষটি হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু। বুধা অনেক সময় যখন মুক্তিযুদ্ধের কথা ভেবেছে, তখনই ছায়ার মতো তাঁর স্বাধীনতার আহ্বান বুধাকে উদ্দীপ্ত করেছে। সমগ্র উপন্যাসটি নির্মাণ করতে সেলিনা হোসেনকে এসব চরিত্রের সাহায্য নিতে হয়েছে। তিনি এর কাহিনীকে পাঠকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন।

উপন্যাসটির ভাষাভঙ্গি, পরিবেশচিত্রণ এবং বর্ণনারীতিও বেশ আকর্ষণীয়। শুরু থেকেই ছোট ছোট বাক্যে, অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে উপন্যাসের কাহিনী গেঁথে তুলেছেন ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন। বুধা যে মুক্ত মানুষ, সেটা বোঝাবার জন্য যে বর্ণনার আশ্রয় নিয়েছেন, তাও চমকপ্রদ। এ রকম প্রাসঙ্গিক কিছু অংশ :

(ক) পথ ওকে ডাকে—আয়। ও হেসে বলে, এই তো এসেছি। দেখ আমাকে। পথ ওকে দেখে।

(খ) ঘুমুবার জায়গা নেই তো কী হয়েছে? দোকানের বারান্দা আছে, গাছতলা আছে, হাটের চালা আছে, ঘাটে বাঁধা নৌকা আছে।

(গ) সব বেলার ভাত নেই তো কী হয়েছে? ফলপাকুড় আছে, নদীর পানি আছে। নোলক বুয়ার মুড়ি ভাজা আছে।

বুধা যে আপন স্বভাবে স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠা এক কিশোর, এই বর্ণনায় আছে তারই ইঙ্গিত। মিলিটারির নির্মম হত্যাকাণ্ড আর যে বর্বরতার দৃশ্য সে দেখেছে, সেই বর্ণনাও সমান আকর্ষক :

গুলি। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সালাম চাচা।

গুলি। পড়ে গেল রবিদা।

গুলি। পড়ে যায় একসঙ্গে অনেকে।

ধানগাছের আড়ালে উবু হয়ে বসে থাকতে পারে না ও। ওর শরীর কাঁপে থরথর করে। হাজার হাজার বোলতা ওর কানের চারপাশে উড়তে থাকে। ও পড়ে যায়। ওর শরীর কাদায় মাখামাখি হয়ে যায়।

আবার বুধা যখন মিলিটারিদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভাবে, তখনকার বর্ণনা এ রকম :

ও পলকহীন সৈনিকদের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভাবছে। ভীষণ ভাবনায় ও গম্ভীর হয়ে যায়। ভাবে, ওদেরকে তো একদিন এ গাঁ থেকে চলে যেতে হবে। ওরা যেভাবে এসেছিল সেভাবেই একদিন ফিরে যাবে। ওদেরকে যেতেই হবে। তবে ওদেরকে কি জ্যান্ত ফিরে যেতে দেয়া উচিত?

এখানে পৌঁছানোর পর ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন বুধার মধ্য দিয়ে 'প্রতিশোধ' গ্রহণের কথা বলেন। এই হচ্ছে লেখকের জীবনভাবনা। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে যে রুখে দাঁড়াতে হয়, প্রতিশোধ গ্রহণ করতে হয়, এই ভাবনারই প্রকাশ ঘটেছে এই উপন্যাসে। শুধু বড়রা নন, একজন কিশোরও যে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারে, এ হচ্ছে সেই কাহিনী। গ্রামের অবহেলিত, প্রান্তিক এক কিশোরের স্বাধীনতাসংগ্রামের গল্প । নতুন প্রজন্মের যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি, তারা এই উপন্যাসটি পড়ে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা পাবে। উপন্যাসটির সার্থকতা মূলত এখানে।

কাকতাড়ুয়া

সেলিনা হোসেন

রাত পোহালে দিনের আলো, সুয্যি ডুবলে আঁধার। ওর কাছে দুটোই সমান। হাটে-মাঠে ঘুরে বেড়ায়। ঘুরতে ঘুরতে যে কোথায় যায় সে হিসেব রাখে না। ওর কাছে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সব সমান। মনে করে যেদিকে চোখ যায়, সেদিকেই ওর জন্য রাস্তা খোলা।

পথ ওকে ডাকে– আয়। ও হেসে বলে, এই তো এসেছি। দেখ আমাকে।

পথ ওকে দেখে। মাঠ-ঘাট ওকে দেখে। ও মনের আনন্দে দুপায়ে পথের ধুলো মাখে। কিসে যে ওর আনন্দ, কিসে কান্না, কেউ বুঝতে পারে না।

ও বোঝে অনেক। সবার মাথার ওপর দিয়ে ওর দৃষ্টি ছুটে যায়। ও তাকিয়ে বলে, দেখ আমাকে। সবাই ওকে দেখে। ওকে দেখা কারও ফুরোয় না। ও এমনই। এই দিনযাপনে ওর কোনো কষ্ট নেই।

ঘুমুবার জায়গা নেই তো কী হয়েছে? দোকানের বারান্দা আছে; গাছতলা আছে, হাটের চালা আছে, ঘাটে বাঁধা নৌকা আছে। নৌকার ছইয়ের ভেতর দিব্যি ঘুমিয়ে থাকা যায়। আর সেসব কিছু না পেলে গেরস্ত বাড়ির কাছারির বারান্দা আছে। আছে দরজাবিহীন ঢেঁকিঘর। টুক করে ঢুকে পড়ে গুটিসুটি শুয়ে থাকা যায়। গেরস্তের উঠোনে খড়ের গাদা আছে। খড় বিছিয়ে শুয়ে পড়লে কেউ দেখতে পায় না। অনেক রাতে ঘুম ভাঙলে মাথার ওপরে তারাভরা আকাশটা দেখতে পায়। পাশ ফিরে শোয়ার সময় টের পায় নেড়ি কুকুরটা খড়ের ওমে গা ডুবিয়ে ওর পাশে শুয়ে আছে। ওকে নড়তে দেখে আলতো করে গা চেটে দেয়। ভালোই লাগে ওর। ও আবার গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়। এমনই রাত কাটে ওর। রাত নিয়ে ওর কোনো ঝামেলা নেই।

সব বেলার ভাত নেই তো কী হয়েছে? ফলপাকুড় আছে, নদীর পানি আছে। নোলক বুয়ার মুড়ি ভাজা আছে। চায়ের দোকানে কাজ করে দিলে চা-বিস্কুট জোটে। ওটুকু খেয়ে রাত কাবার করে দিতে পারে। তা ছাড়া কখনো-সখনো গেরস্ত বাড়িতে ছোট-খাটো কাজের ডাক পড়ে। তখন অড়হর ডালের সঙ্গে ভাত জোটে। নইলে কেউ নুন-পান্তা দেয়। কারও বাড়িতে চালের আটার রুটির সঙ্গে একটুখানি ঝোল পাওয়া যায়। বিয়েবাড়ি হলে ভাত-মাংস পায় পেটপুরে। ওর দিন চলে যায়। এসব নিয়ে ওর কোনো মন খারাপ নেই।

ও ভয় পায় না। ভয় ওকে কাবু করে না। আসলে ভয় কী,তা ও জানেই না। ও ছোটবেলায় ভূতের গল্প শোনেনি। কেউ ওকে জুজুর ভয় দেখায়নি। ও তো নিজের নিয়মে বড় হয়েছে। যে ছেলে নিজের নিয়মে বড় হয় ভয়ের সঙ্গে তার দেখা হয় না। ভয় আড়ালেই থেকে যায়। তাই ছেলেটি চারদিকে খোলা চোখে তাকাতে পারে। কোনো ভয়েই ওকে চোখ বুজে ফেলতে হয় না। ভীষণ সাহস ওর।

কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাচ্ছিস, বুধা?

সোনার ঘরে।

সেটা কী?

ও হাত উল্টে পা বাড়ায়। ওই প্রশ্নের জবাব ও কাউকে দেয় না। যার ঘর নেই তার চারদিকে তো সোনার ঘরই থাকে। এটা কি বলে দিতে হবে? মাঝে মাঝে লোকজন এমন বোকার মতো প্রশ্ন করে, দেখে ওর হাসি পায়। হাসতে হাসতে নিজেকে বলে, মানুষের বোকামির সীমা নেই। ও তাইরে নাইরে করতে করতে পথে হাঁটে। গান গায়। গানে বুক উজাড় করে দেয়। গান ওর ভীষণ প্রিয়। আখড়ার গান শুনে ও গান শেখে। একবার শুনলেই গাইতে পারে। ওর মনে হয়, যার ভেতরে গান থাকে সে অনেক কিছু করতে পারে। সে একটা ভালো মানুষ হয়। এসব ভাবতে ভাবতে

ও পথের ধারে বসে পড়ে। ওর পায়ের কাছে মরা শামুকের খোল পড়ে থাকে। ও বুড়ো আঙুলের মাথায় সেটা তুলে নিয়ে নাচাতে থাকে। নাচাতে নাচাতে ও ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে। ওর পা উঠে থাকে আকাশের দিকে। ও হাত দিয়ে রোদ আড়াল করে। ভাবে, এমন মজার খেলা বুঝি আর হয় না। ও হাতের ফাঁক দিয়ে দেখতে পায় শামুকের খোলটা ওর বুড়ো আঙুলে টুপির মতো লাগছে। লোহার টুপি। বুড়ো আঙুলটা যদি একটা মানুষ হয়, তা হলে খোলটা মানুষের মাথায় একটি অন্যরকম টুপি। মানুষটা বুঝি যুদ্ধ করার জন্য তৈরি হয়েছে। ছেলেটা এমন ভাবনায় নিজের চারপাশ ভরিয়ে তোলে।

ওর দিন এভাবে চলে। কারও খেতে কামলা খাটে, কারও গরু চরায়, কারও মোট বয়। জেলেনৌকায় মাছ ধরে। মুদির দোকানে বসে কেনাবেচা করে। চায়ের দোকানে চা বানায়। খদ্দেরের সামনে চায়ের কাপ নিয়ে যায়। ধানখেতে নিড়ানি দেয়। আরও কত কী! ওর কাজের শেষ নেই।

গাঁয়ের লোকে বলে, ও পাগল হয়নি। শক্ত হয়ে গেছে। জমে শক্ত হয়ে যাওয়া যাকে বলে।

চোখের সামনে মা-বাবা, চার ভাই-বোনকে মরে যেতে দেখলে কেউ কি নরম থাকে? নাকি থাকতে পারে? তার জীবনটা তো আর স্বাভাবিক নিয়মে চলে না। চলার উপায় থাকে না। কলজে খুবলে খায় শকুন। ও দুঃখকে হিংস্র শকুনই ভাবে। এসব ভাবলে ও মগজের ভেতরে শুনতে পায় শকুনের পাখা ঝাপটানি। শকুনের শক্ত চঞ্চুর ঠোকরানোর শব্দ। ওর সামনে জেগে ওঠে একটি ভয়াবহ কুটিল রাত।

কী রকম ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিল সে রাতে! নিস্তব্ধ গ্রাম। মাঝে মাঝে ভেসে আসে কুকুরের কান্না। মনে হয় কেউ যেন সে শব্দ দিয়ে বিনুনি গাঁথছে। সেই শব্দের বিনুনি পেঁচিয়ে রাখে বুকের চারপাশ। হঠাৎ করে কোনো বাড়িতে কান্নার রোল উঠলে ওর মনে হয় আকাশ ফুটো হয়ে একটা কঠিন বজ্রপাত ঘটে যাচ্ছে একের পর এক। ঘরের ভেতরে ওর বাবার শরীর মোচড়াতে থাকে। মোচড়াতে মোচড়াতে স্থির হয়ে যায় চোখের মণি। ঘরে একটিমাত্র কুপি। ফুরিয়ে আসছে তেল। ঘরে কেরোসিন নেই যে কুপিতে আর একটু তেল দেওয়া যাবে। কিংবা কুপিতে তেল দিতে হবে, পাশের ঘরে চাচির কাছে গিয়ে তেল চেয়ে আনতে হবে, এমন কিছু চিন্তা ও করতে পারেনি। তখন তো এসব ভাবনার সময় ছিল না। ও দেখতে পায় একপাশে পড়ে আছে মা। তার বুকে ছোট তিনু। তিনুর বয়স দেড় বছর। রোগা, প্যাকাটির মতো শরীর। বোঝা যাচ্ছে না যে ও বেঁচে আছে কি না। ও তিনুর গায়ে হাত দিয়ে শিউরে ওঠে। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে শরীর। ওর বুকটা ধক করে ওঠে। তিনু ওর কোলে উঠতে খুব ভালোবাসত। ওকে দেখলেই দুহাত বাড়িয়ে আ-আ শব্দ করত। ও ওকে বুকে নিয়ে উঠোনে নেমে যেত। ঘুমপাড়ানি গান গাইত। ওর কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে যেত তিনু। এখন ও কী করবে? তিনুর জন্যে কি একটা গান গাইবে? গান শুনে কি জেগে উঠবে তিনু? ওর কোলে ওঠার জন্য হাত বাড়িয়ে দেবে? ছেলেটির বুক খালি হয়ে যায়। দেখতে পায় ঘরের অন্য পাশে মেঝেতে গড়াচ্ছে শিলু আর তালেব। ওর ছোট দুজনে । দুজনে পিঠাপিঠি। ওদের সঙ্গেই তো ছেলেটির খেলাধুলো, ঘুরে বেড়ানো ছিল। কখনো ফলপাকুড় ভাগাভাগি নিয়ে ঝগড়া বেধে যেত। কত দিন দুজনকে দু-চার ঘা লাগিয়েছে, সে কথা মনে করে বুক ফেটে যায় ওর। পরক্ষণে কিছু বুঝে ওঠার আগেই ও দেখতে পায় ছোট ভাইবোন দুটো একে অপরকে জড়িয়ে ধরেছে। তারপর শেষ। রাত পোহানোর আগে বিনুও চলে যায়। মাত্র কয়েক ঘণ্টা, অথচ ওর জীবনের আকাশ-পাতাল উথাল করা সময়। বিনু ওর পিঠাপিঠি বোন। কত স্মৃতি ওর সঙ্গে। এত কিছু ও ভুলবে কী করে? সেই বিনু আর নেই। বিনুটার চোখ বুজে গেছে। আর কখনো ওই চোখজোড়া খুলবে না। অপূর্ব ছিল বিনুর চোখ। যেন পুরো একটা বিল ঢুকে আছে ওর চোখে। বিনু হাসলে মনে হতো বিলের জলে ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। ওর সামনে পুরা বাড়িটা স্তব্ধ হয়ে গেছে।

একসময় রাত পোহায়। সকাল হতে ও ঠাণ্ডা নিস্প্রাণ শরীরগুলো হাত দিয়ে দেখে সব জমে শক্ত হয়ে গেছে। ও বুঝে যায়, জমে শক্ত হয়ে যাওয়া মানে মৃত্যু। ও কাঁদতে পারে না। নিজেকে আছড়াতে পারে না। অনুভব করতে থাকে ওর পায়ের নিচ থেকে শক্ত হয়ে যেতে শুরু করেছে। সে বোধ ক্রমশ ওপরের দিকে উঠতে থাকে। প্রথমে পায়ের

পাতা। তারপর হাঁটু, উরু, কোমর, পেট, বুক, পিঠ, গলা, নাক, চোখ, কপাল এবং চুল শক্ত হয়ে গেছে। ও পাথরের চোখ মেলে মৃত্যু দেখে। সেবার কলেরায় মহামারিতে উজাড় হয়ে যায় গাঁয়ের অর্ধেক লোক। মাঝে মাঝে নিজের দিকে তাকিয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করে, কীভাবে বেঁচে গেলাম। সেই মৃত্যু এবং অন্ধকার রাতের কথা মনে করলে ওর আর কোনো ভয় থাকে না। বুঝতে পারে না গাঁয়ের লোকে ওকে পাগল বলে কেন, আসলে ও তো একটি সাহসী বালক হয়েছে।

ও মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুহাত দুপাশে সোজা করে জামাটা মাথায় বেঁধে কাকতাড়ুয়ার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে। দেখতে পায় কানের পাশ দিয়ে উড়ে যায় বোলতা। বোঁ করে একটা শব্দের তরঙ্গ উঠে মুহূর্তে মিলিয়ে যায় বাতাসে। ওর মনে হয় ওটা বোলতার ডাক নয়, শব্দটা ওর চাচির কণ্ঠ। চাচি ওকে সকালে মরিচ পুড়িয়ে পান্তাভাত খেতে দিয়ে বলছে, রোজ রোজ কেবল ভাত গেলা। ঢ্যাঙা তো কম হসনি। কামাই করতে পারিস না,বাপু?

কামাই!

ভাত খেতে খেতে ও শব্দটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে। শক্ত হয়ে থাকা মগজের গায়ে শব্দটা ঠোক্কর খায়।

তোর মা-বাপ তো মরে খালাস। এখন জ্বালা আমার। পরের ছেলের বোঝা টানতে পারি না,বাপু।

বোঝা! শব্দটা ওর শক্ত হয়ে থাকা বুকের মাটিতে বলের মতো লাফায়। ও ভাবতে থাকে।

শোন বুধা, তুই তো দেখতেই পাস যে তোর চাচার রোজগার নেই। তোর আটজন চাচাতো ভাইবোন, দিন চলে না।

ও নীরবে ভাত খায়। পোড়া মরিচ ডলে ডলে ভাত লাল করে ফেলেছে। আশ্চর্য, ঝালে ওর জিব পুড়ছে না। কেমন অদ্ভুত স্বাদ হয়ে ভাতের লাল দলা গলা দিয়ে নামছে। শুধু ওর চোখে পানি আসতে চায়। কিন্তু সে পানিও বাধা পায়। গড়ায় না।

চাচি খানিকটা ধমকের সুরে বলে, কি রে কথা বলছিস না যে?

আমি কামাই করব।

চাচির চোখ উজ্জ্বল হয়।

সত্যি কামাই করবি?

নিজের বোঝা নিজে বইব।

সত্যি?

তাহলে তুই আমাকে মুক্তি দিবি?

হ্যাঁ, সত্যি।

মুক্তি! শব্দটি শুনে ও হোঁচট খায়। গলায় ভাত আটকে গেলে ও জোরে জোরে কাশতে থাকে। চাচি ওকে পানির গ্লাস এগিয়ে দেয়।

পানি খা, বাপু। এত অল্পে কেন যে তোর চোখ লাল হয়ে যায়। ছোটবেলায় তুই খুব লক্ষ্মী ছেলে ছিলি। একদম মায়ের নেওটা। এক রাতে মানুষগুলো মরে যাওয়ার পর তুই যে কেমন হয়ে গেলি! কিছু হলেই তোর চোখ লাল হয়ে যায়।

সত্যি আমার চোখ লাল হয়ে যায়?

হ্যাঁ রে, সত্যি। একটুও মিছে বলছি না।

আমি ভেবেছিলাম আমার চোখটা পাথরের চোখ হয়ে গেছে। কিছু দেখতে পাই না, চাচি।

না রে না, সে যে কেমন লাল আমি তোকে বোঝাতে পারব না। তখন তোকে দেখলে আমার সালাম করতে ইচ্ছে করে। মনে হয়,তুই আমার মুরব্বি। হয় আমার বাবা, না হয় চাচা।

কেন যে আমাকে লজ্জা দেন চাচি।

তোকে লজ্জা দিতে চাই না রে। আমার কি সাধ্য যে–

ওর চাচি কথা শেষ করতে পারে না। আঁচলে চোখ মোছে। তারপর রান্নাঘরের দরজায় বসে গুনগুনিয়ে কাঁদে।

চাচির কান্না ছেলেটি শুনতে পায় না। সেদিকে ওর খেয়াল নেই। চাচির কথা শুনে ছেলেটি ভীষণ খুশি হয়। মনে হয়, নিজেই সেই বোলতাটার মতো শব্দ করতে করতে উড়ে যাচ্ছে। বাসনের বাকি ভাতটুকু ধীরেসুস্থে শেষ করে। বুঝে যায় ওর কোনো ভয় নেই। ও কতবার এমন করে নিজেকে আবিষ্কার করবে? কতবার নিজের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারবে যে ওর ভয় নেই? আজ ওর ভারি আনন্দের দিন। লাল চোখের কথা ভাবতে ভাবতে ও একদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। ও আর কখনো ওই বাড়িতে থাকার জন্য ফিরে যায়নি। গিয়েছে চাচির সঙ্গে দেখা করতে। কখনো ছোট ভাইবোনগুলোকে ফলপাকুড়ের ভাগ দিতে গিয়েছে। বারান্দায় বসে দুদণ্ড গালগল্প করেছে। চাচি আঁচল দিয়ে ওর মুখের ঘাম মুছিয়ে দিয়েছে। বোনেরা পানি দিয়েছে। গুড়-মুড়ি দিয়েছে। ও কখনো খেয়েছে, কখনো খায় নি। শুধু ওর মনে হয়েছে ও গেলেই কুন্তির চোখ ছলছল করত। ও একটি কথাও বলত না। চুপচাপ বসে থাকত। অপলক তাকিয়ে থাকত। ওই বাড়িতে গেলেই ওর বুক ভার হয়ে যেত। ও ওর শক্ত হয়ে যাওয়া বুকের বোঝা আর বাড়াতে চাইত না।

যেদিন ও চাচির বাড়ি থেকে একবারের জন্য বেরিয়ে এলো সেদিন ভেবেছিল, সম্পর্ক ভেঙে দেওয়ার মানে কি মুক্তি? সম্পর্ক কি ভাঙা যায়? ছেলেটি উত্তর পায় না। বুঝতে পারে না সম্পর্ক কী? বাবা মরে গেলে কি চাচি পর হয়ে যায়? অথচ চাচাতো বোন ছোট্ট কুন্তি সম্পর্কের অধিকার নিয়ে ওর সামনে দাঁড়িয়েছিল। সেদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পরে কাঁদতে কাঁদতে ওর পিছে পিছে এসেছিল। বলেছিল, তুমি যেয়ো না, বুধা ভাই।

ও কুন্তির কথায় ফিরে তাকায়। কুন্তির কান্নাভেজা কণ্ঠস্বর শুনে ওর চোখ থেকে লাল আভা মুছে যায়। ও বুঝতে পারে ওর বুকের ভেতরটায় জখম হয়েছে। ক্ষত থেকে রক্ত পড়ছে। আশ্চর্য, সম্পর্ক কী এমন? কুন্তি না হয়ে আর কেউ হলে ও কি এমন কষ্ট পেত? কুন্তি ওর হাত ধরে বলেছিল, তুমি যেয়ো না, বুধা ভাই।

যাব না।

হ্যাঁ, যেয়ো না।

কেন?

তুমি চলে গেলে আমার খুব খারাপ লাগবে।

খারাপ লাগবে? কেন?

কুন্তির কণ্ঠস্বর এক মুহূর্তে যেন বদলে যায়। ওর মনে হয় এই কণ্ঠস্বর ওর কাছে নতুন আবিষ্কার। ও কুন্তির মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, আজ যাই। আর একদিন আসব।

কবে আসবে?

গাঁয়েই তো থাকব। যখন মন চাইবে তখন আসব।

এটা কি আসা হলো?

এটা আসা হলো না?

না, একটুও ভালো আসা না।

ভালো আসা কী, আমি তো জানি না, কুন্তি। তারপর খুশি হয়ে বলে, ঠিক আছে আমি একদিন ভীষণ ভালোভাবে আসব।

কবে? খুশিতে কুন্তির দুচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কবে, আসবে বুধা ভাই?

তোর বিয়ের সময়।

২০১৬

বিয়ে? আমার তো বিয়ে হবে না। বড় বুয়াদেরই তো বিয়ে হয়নি। আমাকে কে বিয়ে করবে?

করবে, করবে। দেখবি লাল টুকটুকে বর আসবে।

তোমার মতো?

'ধুৎ বোকা! আমার মতো হবে কেন? আমি কি একটা ছেলে হলাম? আমি তো এখন পথের ছেলে। এতিম। অনেক সুন্দর, অনেক ভালো বর পাবি তুই।

কুন্তির চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়ায়। ও কাঁদতে কাঁদতে বলে, তোমার মতো কেউ ভালো নয়। বুধা বলে, আমি যাই রে, কুন্তি। তুই বাড়ি যা। চাচি দেখলে তোকে বকবে। আমি চাই না আমার জন্য তোকে বকা খেতে হোক।

কুন্তি পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে কাঁদে। ছেলেটি পেছনে তাকায় না। ওর মনে হতে থাকে, কুন্তি যেন চিৎকার করে বলছে, তোমার মতো কেউ ভালো নয়। ও বুঝতে পারে না। ও যদি এতই ভালো হবে,তবে চাচি কেন ওকে সইতে পারল না? তা হলে সম্পর্কটা কি এমন যে কারও কাছে ভালো, কারও কাছে খারাপ? ভাবতে ভাবতে ও মাঠের মাঝখানে কাকতাড়ুয়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এটা ওর খেলা। এমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থেকেই ও মানুষের আদর পেতে চায়। এই খেলা খেলতে খেলতেই ও বড় হতে চায়। ও দেখে কাঠফাটা রোদে দাঁড়িয়ে থাকলে একসময় ওর মাথার ওপর শকুনের ছায়া নেমে আসে। ওকে দেখলে শকুনের বুঝি মনে হয় মরা মানুষ। তালগাছের ওপর থেকে সাঁই করে উড়ে আসে। আসলে কাকতাড়ুয়ার ভেতরে ও গাঁয়ের বেশির ভাগ মানুষকে দেখতে পায়। ওরা এমনই কাকতাড়ুয়া। ছন্নছাড়া। পথেঘাটের, হাটবাজারে। বাড়ি নেই। পেটভরা ভাত নেই। শুধু গাঁয়ের কয়েকজন মানুষ শকুনের মতো। কাকতাড়ুয়া ওদের ভয়ে তটস্থ থাকে।

গাঁয়ের লোকে ওর নাম দিয়েছে কাকতাড়ুয়া। নোলক বুয়া ডাকে ছন্নছাড়া। হরিকাকুর জালে প্রচুর মাছ উঠলে ওর দিকে তাকিয়ে ফোকলা গালে হেসে বলে, মানিকরতন। পাকা ধান কাটার সময় জয়নাল চাচা ওকে বাবা ছাড়া কথা বলে না। বলে, সোনাবাবা। হাটের দিনে ডালাভরা বাজার নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে হাশেম মিয়া বলে, ও খোকনবাবু, আজ তুই আমার বাড়িতে ভাত খাবি। লোকটা বেশি সওদা করতে পারলে আত্মহারা হয়ে যেত। গাঁয়ের গোবর-কুড়ানি বুড়িটা ওকে গোবররাজা বলে ডাকে। অনেক দিন ও বুড়িকে গোবর কুড়িয়ে দিয়েছে। ওর তো অনেক নাম। এতে ও ভীষণ খুশি।

ওর মনে হয় ভালোই তো। যার যা খুশি সে নামেই আমাকে ডাকুক। একজনের অনেক রকম নাম থাকলে সেসব নামের ভেতর দিয়ে অনেক রকম মানুষ হতে পারে। ও অনেক রকম মানুষ হতে চায়। কেন? যেমন, কুন্তির ভাবনার মতো ভালো। নোলক বুয়ার ভাবনার মতো সাহসী। চাচির কথার মতো লাল চোখের মানুষ। ভরা মাছের জাল টেনে তুললে হরিকাকুর দুচোখের বিস্ময়ে লেখা হয় একটি শব্দ, শক্তিশালী। আর কী? বিশ্বাসী? হ্যাঁ। পরোপকারী? হ্যাঁ। সহৃদয়? হ্যাঁ। বন্ধুত্বসুলভ? হ্যাঁ। আর কী। সবকিছু, সবকিছু। ও ভাবতে ভাবতে ছুট দেয়। মাঠ পেরিয়ে, ঘাট পেরিয়ে, নদী পেরিয়ে ছুটতে থাকে। ওর কল্পনায় ভেসে ওঠে তেপান্তরের মাঠ, পঙ্খিরাজ ঘোড়া, সাত সমুদ্র তেরো নদী।

এভাবে ওর দিন ভালোই কাটছে। চাচির প্রতি ও কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে। ভাবে, চাচি ওকে মুক্তির কথা বলে স্বাধীন মানুষ হওয়ার স্বপ্ন দিয়েছে। কী মজা স্বাধীন মানুষ, স্বাধীন মানুষ। ও স্বাধীন মানুষ বলতে বলতে বাজারে এলে হাবু দোকানদার ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করে, কী বলছিস রে, বুধা?

স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা? দূর বোকা।

ছেলেটি ঘাড় বাঁকিয়ে বলে, স্বাধীনতা ভীষণ আনন্দের। স্বাধীনতা খুব দরকার। আমি তো এখন স্বাধীন মানুষ।

দোকানদার নিজের কাজে মন দিতে দিতে বলে, ছেলেটার পাগলামি গেল না।

২০১৬

একদিন ও কাকতাড়ুয়া খেলার সময় দেখতে পায় গাঁয়ে মিলিটারি এসেছে। ও আগেই শুনেছে দেশে যুদ্ধ লেগেছে। মিলিটারি শহর-গ্রাম জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে। কিন্তু মিলিটারি কেমন—তেমন কোনো ধারণা ওর ছিল না। থাকবেই বা কী করে। এর আগে গাঁয়ে তো কখনো মিলিটারি আসেনি।এসেছে পুলিশ। পুলিশ দেখে ওর ভয় লাগেনি। উল্টো পুলিশ গাঁয়ের রবি চোরকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় ওরা অনেক ছেলেমেয়ে ওদের পিছে পিছে থানা পর্যন্ত গিয়েছিল। হল্লা করে যেতে সেবার ওর বেশ মজাই লেগেছিল।

কিন্তু এবার মিলিটারি আসে জিপে করে। গুলি ছুড়তে ছুড়তে। বুটের শব্দ যেন চড়চড় শব্দে ফুটছিল। যেন যেখানে পা পড়ছে সেই মাটি ফেটে চৌচির হয়ে ফুটছে। ও দূরে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। বড় সড়কের মাঝ বরাবর মিলিটারির জিপ থেকে ওরা ঝপঝপিয়ে নামে। ও ওদের বাজারের দিকে ছুটে যেতে দেখে। ও ধানগাছের আড়ালে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকে। একটু পর পর মাথা ওঠায়। কোন দিকে গেল লোকগুলো? পরক্ষণে ভেসে আসে আর্তনাদ। একটু পর বাজারের চালাগুলো দাউদাউ পুড়তে থাকে। ও আতঙ্কে ধানখেতের কাদায় মিশে যায়। অবাক কাণ্ড! ও বুঝতে পারে ওর মাথার মধ্য দিয়ে দ্রুত অনেক কিছু পার হয়ে যাচ্ছে। মিলিটারি চলে গেলে ও ছুটে বাজারের সামনে এসে দাঁড়ায়। কেউ কেউ হয় আগুনে পুড়ে, নয় গুলি খেয়ে মরেছে। অনেকে মারা যায়নি, কিন্তু আহত হয়েছে। যারা বেঁচে আছে তারা ছোটাছুটি করে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে। ও নিজেও একটা মাটির হাঁড়ি নিয়ে ডোবা থেকে পানি আনে। পানি আনতে আনতে ওর রাগ বাড়তে থাকে। ও মনে মনে ফুঁসতে থাকে। প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ওর বুকের ভেতর ঢুপঢাপ শব্দ তোলে। একসময় আগুন নিভে গেলে আধা-পোড়া বাজারটার দিকে তাকিয়ে ওর চোখ লাল হতে থাকে।

একজন ওকে বলে, কী হয়েছে, বুধা?

কিছু না।

আগুনের ধোঁয়ায় তোর চোখ লাল হয়ে গেছে।

আমার কিছু হয়নি।

আমার সঙ্গে চল। আমার বাড়িতে থাকবি।

না। আমি এই বাজারে থাকব। আধা-পোড়া ঘরের ছাদের নিচে আমি ঘুমাতে পারব।

লোকটি হাঁ করে থেকে মুখ ভেঙচিয়ে বলে, তুই মানুষ হবি না।

মানুষ হব না, মানুষ হব না, মানুষ হব না বলতে বলতে ও আবার ছুটে যায়। ওর বুকের ভেতরে ভীষণ কিছু গজিয়ে উঠলে ও নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। কান পেতে নদীর কুলকুল ধ্বনি শোনে। জলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে ওর দৃষ্টি জমাট হয়ে যায়।

পরদিন গাঁয়ের অনেক মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে থাকে। ও প্রথমে নোলক বুয়ার কাছে ছুটে যায়। গিয়ে তো চক্ষু চড়কগাছ। নোলক বুয়ার বাঁধাছাঁদা শেষ। কোথায় গেল তার মুড়ি ভাজার সরঞ্জাম! খ্যাংরা কাঠির ছড়া উঠোনে গড়ায়। মাটির হাঁড়ি উল্টে পড়ে ভেঙে আছে। মুড়ির টিনগুলো ঘরের চালায় ঝুলছে। বেরোনোর আগে নোলক বুয়া ওকে জড়িয়ে ধরে।

ছন্নছাড়া, আমার সঙ্গে চল।

কোথায়?

যেদিকে দুচোখ যায়। কোথাও না কোথাও একটা আশ্রয় তো জুটবে।

কিন্তু কেন যাব?

নোলক বুয়া অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। তার মোটাসোটা শরীরটা নড়ে না। প্রবল বিস্ময়ে বলে, এখন কি জিজ্ঞেস করার সময়? প্রশ্ন করছিস যে? দেখলি না কত কী ঘটে গেল? ওরা তো আবার আসবে। তখন যাকে পাবে তাকে মারবে। আমরা কেউ বাঁচব না।

সবাই গেলে গাঁয়ে কে থাকবে?

শোনো ছেলের কথা! এখন কি এত কথা বলার সময় আছে? তোর হয়েছে কী বল তো? বাপ-মা, ভাইবোন সব তো গেছে। এখন কি তোর নিজের যাওয়ার শখ হয়েছে?

ও নোলক বুয়ার সঙ্গে কথা বলে না। নোলক বুয়া ওর কথার উত্তর দেয়নি। নোলক বুয়া কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়। ও নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে। ও তো জানে, কেউ না থাকলে ও একাই থাকবে। কেন পালাবে? যে পালায় সে ভীতু। বোকা। সবার তো উচিত গাঁয়ে থেকে লড়াই করা। লড়াই লড়াই বলতে বলতে ও হাঁটতে শুরু করে। অনেকে তখন পথে নেমেছে। ও সবার সঙ্গে কথা বলতে পারে না। কারণ,তারা ওর দিকে তাকানোর সময় পায় না। ওরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। ভয়ে, আতঙ্কে ওরা পালাচ্ছে। বড় জামগাছটার নিচে দেখা হয় হরিকাকুর সঙ্গে। বেচারা লটবহরের বোঝায় কাহিল। হরিকাকুর জন্য ওর ভীষণ মায়া হয়। কত দিন ধরে কাকিমা অসুস্থ। ঠিকমতো হাঁটতেই পারছে না। কাকিমা ওকে দেখে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে।

দেখ তো মানিকরতন, এই বয়সে কেউ কি বাড়িঘর ছেড়ে বেরোতে পারে?

কেঁদো না, কাকি। পালাও। তোমাদের বাঁচতে হবে তো। তুমি তো লড়াই করতে পারবে না। শুধু শুধু ওদের হাতে মরবে কেন? তোমার বোঝা আমাকে দাও, কাকু। আমি তোমাকে খানিকটা পথ এগিয়ে দিয়ে আসি।

এগিয়ে দিবি কেন? মানিকরতন, তুই আমার সঙ্গে চল। তোকে গাঁয়ে রেখে যেতে আমার মন চায় না রে।

তোমার সঙ্গে আমি কেন যাব? গাঁয়ে থাকবে কে? তোমার ভিটে দেখবে কে? চলো, তোমাকে খানিকটা পথ এগিয়ে দিয়ে আসি। দেরি হয়ে যাচ্ছে। বেলা বাড়লে রোদে তোমাদের কষ্ট হবে। আমি তো চাই যে তোমাদের যেন কষ্ট না হয়। হরিকাকু ওর মাথায় বোঝা দিয়ে সোজা হয়ে হাঁটে। বড় সড়কের ধারে এসে বলে, এবার তুই যা। এখন আমি পারব। ফিরে এসে তোর সঙ্গে আমার দেখা হবে তো, মানিকরতন?

হবে গো, হবে। ভাবছ কেন?

ছেলেটি হরিকাকুর চলে যাওয়া দেখে। কত বয়স হলো কাকুর? হেঁটে যেতে পারবে তো? নাকি পথের ধারে মরে পড়ে থাকবে? তখন কে ওকে মানিকরতন ডাকবে? ওর চোখ ভিজে ওঠে।

ফেরার পথে দেখা হয় রানির সঙ্গে। ওদের পুরো পরিবার চলে যাচ্ছে। রানি ভয়জড়ানো কণ্ঠে বলে, যাচ্ছি রে, কাকতাড়ুয়া।

যা, ফিরে এলে দেখা হবে। ঠিকমতো যাস। ভয় পাস না।

তুই কিন্তু আর কাকতাড়ুয়া খেলা খেলিস নে। মিলিটারি গুলি করতে পারে। দুষ্টুমি করিস না, কাকতাড়ুয়া। তোকে নিয়ে আমার ভীষণ ভয় হয়। তুই যে কী ঘটিয়ে ফেলবি কে জানে!

আমাকে নিয়ে তোর এত ভাবতে হবে না। তুই তোর পথে যা। তুই তো একটা ভীতুর ডিম। সে জন্য পালাচ্ছিস। আমি পালাব না। লড়াই করব।

লড়াই করবি?

হ্যাঁ, লড়াই, লড়াই। যা, যা ভাগ।

রানি দুচোখে বিস্ময় ছড়িয়ে বলে, ইস কত বাহাদুর, যেন বীর! লড়াই করবে? সেদিনের ছোঁড়া, ঢঙ কত!

ও আর কথা না বলে হাসতে হাসতে পা বাড়ায়। ও কোথায় যাবে? চাচা কাজ খুঁজতে শহরে গিয়েছিল ছয় মাস আগে। ফেরেনি। চাচি এখন গাঁয়ে নেই। ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়ি গেছে। লোকমুখে এসব খবর পায় ও। চাচি তো ওর খবর রাখে না। ও নিজে খবর নিলে তবেই খবর পাওয়া।

ওই বাড়িতে কুন্তিই ওকে নিয়ে যা একটু ভাবে। কখনো মোয়া-মুড়কি খেতে দেয়। এইটুকুই। অবশ্য এ নিয়ে ওর মাথাব্যথাও নেই।

আস্তে আস্তে গাঁয়ের মানুষের দিন সহজ হয়ে আসে। মিলিটারির আক্রমণের পর দুই মাস গড়িয়ে গেছে। যারা এদিক-ওদিক পালিয়ে গিয়েছিল একে-দুয়ে তারা অনেকে ফিরে এসেছে। শুনতে পায় অনেকে ইন্ডিয়া চলে গেছে। ইন্ডিয়া কোথায় ও জানে না। জানার দরকার নেই। নোলক বুয়ার কথা খুব মনে পড়ছে। কোথায় যে গেল কে জানে! হরিকাকুরও কোনো খবর নেই। যাদের কথা ও জানতে চায় তাদের খবর নেই। যারা ওর কেউ নয় তারাই আছে গাঁ-জুড়ে। ওর চাচিও ফিরে এসেছে। কিন্তু ওর সঙ্গে দেখা হয়নি। ও যায়নি ওই বাড়িতে। শুধু দূর থেকে দেখেছে কুন্তি বড় হয়েছে। ওকে দেখতে এখন অন্য রকম লাগে।

এর মধ্যে গাঁয়ে আবার মিলিটারি আসে। ক্যাম্প বানায়। ক্যাম্পের পাহারায় থাকে ওদের কেউ কেউ। রাইফেল হাতে সেই ক্যাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে ওদের দেখে। এমন মানুষ ও আগে কখনো দেখেনি। ওরা কোথা থেকে এসেছে? কোথায় ওদের দেশ? ওরা কি এ দেশের মানুষ? ওরা যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষাটা ও বুঝতে পারে না। গাঁয়ের মানুষ কেউই ভালো করে বুঝতে পারে না। দু-একজন ভাঙা ভাঙা ভাষায় কীসব বলে। সে ভাষা শুনতে আরও বিদঘুটে লাগে ওর। ওরা এ দেশের মানুষ হলে ও ওদের ভাষা বুঝতে পারবে না কেন? ও নিজের মতো করে ভাবতে পারে না। কেমন বিদঘুটে লাগে। বোলতাটা কোথা থেকে উড়ে এসে ওর মাথায় বসে। বোঁ বোঁ শব্দ ওর কানে ঢোকে। যেন ফটফট শব্দে ফেটে যাচ্ছে বাঁশ, বাজারটা পুড়ছে। সেদিনের দৃশ্যটা ওর চোখের সামনে ফর্সা হয়ে যায়। সেদিনের পর একদিনও সেই দৃশ্যটা ও নিজের মগজে খোলসা হতে দেখেনি। আজ ক্যাম্পের সামনে একজন সৈনিককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওর মাথায় দৃশ্যটা নতুন করে ফিরে আসে।

গুলি। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সালাম চাচা।

গুলি। পড়ে গেল রবিদা।

গুলি। পড়ে যায় একসঙ্গে অনেকে।

ধানগাছের আড়ালে উবু হয়ে বসে থাকতে পারে না ও। ওর শরীর কাঁপে থরথর করে। হাজার হাজার বোলতা ওর কানের চারপাশে উড়তে থাকে। ও পড়ে যায়। ওর শরীর কাদায় মাখামাখি হয়ে যায়। ও আবার উঠে বসে।

দেখে পড়ে যায় মফিজ, শফি, মতি, আজাহার ভাই, মদন কাকু, শরিফ চাচা, আরও অনেকে। কারও নাম ভোলেনি ও। প্রত্যেকের নাম মনে আছে। চেহারা গেঁথে আছে বুকের ভেতর। একটা কিয়ামত ঘটিয়ে মিলিটারি চলে গেলে সেদিন বিকেলে গাঁয়ের আর সবার সঙ্গে লাশ দাফন করেছে ও। বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কেটে এনেছে। বরই পাতা দিয়ে পানি সিদ্ধ করেছে। জানাজা পড়েছে। শুধু এই প্রথম ও কাফনের কাপড় ছাড়া কবর হতে দেখেছে। আর অনেক মানুষের একসঙ্গে একটা কবর হতে দেখেছে। ওর বারবার বলতে ইচ্ছে করেছিল যে, এমন করে কবর দিও না। সবাইকে আলাদা করে কবর দাও। কিন্তু বলতে পারেনি। শুধু হাবিব ভাই কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, এই গাঁয়ে একটা গণকবর হবে আমরা কি কোনো দিন ভাবতে পেরেছিলাম?

ও নিজেও কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞেস করেছিল, গণকবর কী, হাবিব ভাই?

এই যে সবাইকে একসঙ্গে গাদানো।

গাদানো! ভীষণ কষ্টে ও শব্দটা নিজের ভেতর টেনে নেয়। তারপর বিড়বিড়িয়ে বলে, প্রতিশোধ! এমন হতে পারে এই অভিজ্ঞতা হয়েছে বলে ওর কষ্ট হচ্ছে। ওর ভেতরের বোলতাটা তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। ও পলকহীন সৈনিকদের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভাবছে। ভীষণ ভাবনায় ও গম্ভীর হয়ে যায়। ভাবে, ওদের তো একদিন এই গাঁ থেকে চলে যেতে হবে। ওরা যেভাবে এসেছিল সেভাবেই একদিন ফিরে যাবে। ওদের যেতেই হবে। তবে ওদের কি জ্যান্ত ফিরে যেতে দেওয়া উচিত? একবার কলেরা মহামারি এই গাঁয়ে মৃত্যুর উৎপাত ঘটিয়েছিল। এবার মৃত্যুর উৎপাত শুরু করেছে ভিন্ন রকমের মানুষ। কলেরা সাত দিনের মাথায় চলে গিয়েছিল। এরা কি যাবে নাকি তাড়াতে হবে? কলেরাকে ও ছুঁতে পারেনি। কিন্তু ওই মানুষগুলোকে তো ছুঁতে পারে। ওদের হাত-পা-মাথা-বুক-পিঠ সব ছোঁয়া যায়। কলেরা যখন এসেছিল তখন ও ছোট ছিল। এখন ও বড় হয়েছে। গায়ে জোর আছে। সাহস আছে। বুদ্ধি

২০১৫

আছে। তবে ছাড়বে কেন? ও বুঝতে পারে ওর, চোখ লাল হয়ে যায়। চোখ লাল হলে ওর ভেতরে একটা কিছু করার ইচ্ছা প্রতিজ্ঞা হয়ে যায়। ও বাজারে ফিরে আসে। ভাবে, কোথাও পালাবে না। দরকার হলে এই পোড়া ঘরগুলোর নিচে খেঁকশিয়ালের মতো গুটিয়ে-গাটিয়ে থাকবে। ও ছাই-কয়লা সরিয়ে ঘরের নিচে জায়গা করে নেয়। ঝাড়ু জোগাড় করে পরিষ্কার করে। বেশ ছিমছাম হয়। নিজের ছেঁড়া কাঁথাটা ভাঁজ করে এক জায়গায় রেখে দেয়। মাদুর বিছিয়ে নেয় মেঝেতে। বেশ লাগে এই পোড়া ঘর। ও চিত হয়ে শুয়ে দুহাত দুদিকে মেলে দেয়। ভাবে, ও এখন পোড়াঘরের কাকতাড়ুয়া। এভাবেই ও শিস বাজায়। শিস বাজাতে বাজাতে ওর ঘুম পায়। ও ঘুমিয়ে পড়ে। স্বপ্নে নিজের বুকের ভেতরে আনন্দের জোয়ার বয়ে যাওয়া অনুভব করে।

অনেক রাতে কখনো কখনো গুলির শব্দে ঘুম ভেঙে যায় ওর। ওরা কি কাউকে মেরে ফেলল? এত রাতে কাকে? কোন মায়ের বুক শূন্য হয়ে গেল? ও বিড়বিড় করে বলে, তোমরা যারা আমাদের ঘর পোড়ালে, বাজার পোড়ালে, মানুষ মারলে, গাঁয়ে গণকবর বানালে, লোকজনকে বাড়িঘর ছাড়ালে, তোমরা কি এমনি এমনি চলে যাবে? একটা ঘুষিও কি তোমাদের পাওনা হয়নি? আমরা কি এতই দুর্বল? কলেরা আমাকে খেতে পারেনি। আমি তোমাদের জন্য বেঁচে আছি। আমার হাত দিয়েই তোমাদের একটা কিছু পাওনা হবে। ঠিক, দেখো, একটা কিছু তোমাদের আমি দেবই। ও ছাদের ফুটো দিয়ে তারাভরা আকাশের দিকে তাকায়। তবে কি বঙ্গবন্ধু এই মানুষগুলোর বিরুদ্ধে লড়ার কথা বলেছিলেন? হ্যাঁ, এরাই তারা। ও ঠিক বুঝে গেছে। কারও কাছে জিজ্ঞেস করে এ কথা আর জানতে হবে না। বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ ও কানু দয়ালের বাড়িতে বসে রেডিওতে শুনেছিল। সেই রক্ত গরম করা ভাষণ শুনে ও মধুকে বলেছিল, এখন থেকে তোরা আমাকে বঙ্গবন্ধু বলে ডাকবি।

ইস শখ কত! বানরের আবার চাঁদে যাওয়ার সাধ।

কী আমি বানর?

হ্যাঁ, বানর। তুই একশবার বানর।

মধু হি-হি করে হেসেছিল। সেই মধু আর নেই। আগুনে পুড়ে গেছে। ও চিনতে পারে নি কোনটা মধুর লাশ। মধুর মা-বাবা গাঁয়েই আছে। এখনো পালায়নি। মধুর বড় ভাই মিঠু লুকিয়ে লুকিয়ে থাকে। জোয়ান ছেলেদের যে ওরা ধরে নিয়ে মারছে। এতকিছু ভেবে ওর ভীষণ কান্না পায়। দুইবছর আগের সেই শীতল মৃত্যুর রাতের কথা মনে পড়ে। সেই রাতে বাবা মারা যাওয়ার পরও মা জীবিত ছিল। ওকে ডেকেছিল। বাবা বুধা, বাবা, বাবা রে?

ওহ সেই কণ্ঠ কেমন শীতল, যেন মৃত্যুপুরীর হাওয়া বয়ে এসেছিল ওর কাছে। ও হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল মায়ের ওপরে, মা, মাগো।

বাবা, তোকে আল্লাহর ভরসায় রেখে গেলাম। বাবা রে–

মাগো!

না, আর কোনো কথা ছিল না। আর কেউ ওকে কিছু বলেনি। টুপটুপ করে ঝরে গেছে কেবল। গাছ ঝাঁকানি দিলে যেমন বরই ঝরে পড়ে তেমন। ও পাগলের মতো চিৎকার করেছিল। ছুটে গিয়েছিল চাচার ঘরের দরজায়। বলতে চেয়েছিল, তোমরা দেখ, এই ঘরের ভেতর কী হচ্ছে। বলা হয়নি। ও মৃত্যুপুরীর স্তব্ধ শীতলতায় নিঃসাড় বসেছিল। ভাবলে এখন আর বুক মোচড়ায় না, শরীরটা তো জমাট শক্ত হয়ে গেছে। হঠাৎ মনে হয়, কে যেন ডাকছে।

বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু!

এই তো আমি এখানে।

ও উঠে বসে। কোথাও কেউ নেই। ও নিজের বুকের কথাই শুনতে পাচ্ছে। ফুটো ছাদ দিয়ে বাতাস ভরে যাচ্ছে ভাঙা ঘরে। ও বুকভরে শ্বাস টেনে বসেই থাকে। কদিন ধরে ও খেয়াল করছে গাঁয়ের কয়েকজন টাকাওয়ালা মানুষ; যারা গাঁ থেকে পালায়নি, তারা মিলিটারির সঙ্গে বেশ যোগাযোগ করছে। ওদের ক্যাম্পে গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি, মাছ, ডিম,

দুধ পাঠাচ্ছে। সৈনিকগুলোর ভীষণ ফুর্তি। খায়দায় ঘোরাফেরা করে। দরকারমতো একে-ওকে ধরে নিয়ে যায়। ক্যাম্পের সামনে বেঁধে রাখে। নয়তো কোথায় যে গায়েব করে দেয় ওর আর খোঁজ পাওয়া যায় না। ও পোড়াঘরের নিচে বসে ছটফট করে। মিলিটারি তো বিদেশি মানুষ। ওরা এ গাঁ চেনে না। ভাষা জানে না। ওদের আপন ভাবা যায় না। কিন্তু দেশের মানুষ কেন ওদের সঙ্গে মিশেছে? কেন বিদেশিদের মতো আচরণ করছে? গাঁয়ের মানুষদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে ক্যাম্পে? তারপর ওদের লাশ খেতে উড়ে আসে শকুন। বিদেশি মানুষ এবং নিজেদের মানুষ সবার ওপর ওর ঘৃণা বাড়তে থাকে। ভোর হলে ও পোড়া ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। দিনের বেলা ও নিজের বুকের কথা শুনতে পায় না। রাতই ওকে তাড়ায় বেশি। ওর ভীষণ খিদে পেয়েছে। খাবে কী?

ও বাজারের মাঝ দিয়ে হাঁটতে থাকে। কেউ কেউ আবার নতুন করে দোকানঘর তোলার চেষ্টা করছে। আলি কড়ইগাছের নিচে বাঁশের বেঞ্চি বানিয়ে চা বিক্রি করতে শুরু করেছে। আলি ওকে বলেছে, ওই শত্রুদের না তাড়িয়ে আমি আর চায়ের দোকান বানাব না। তুই যত দিন খুশি ওই পোড়া ঘরে থাকবি। ওকে দেখেই আলি ডাক দেয়।

বুধা, এদিকে আয়।

খিদে পেয়েছে, আলি ভাই।

নে, চা-বিস্কুট খা। এতে হবে না?

খুব হবে। আমি কি কোনো দিন দুটো বিস্কুট একসঙ্গে খাই?

আলি হাসতে হাসতে বলে, আমি তো জানি তুই কী খাস! রোদ খেলে তোর পেট ভরে। জোছনা খেলে তোর মন ভরে। বৃষ্টির পানি খেলে তোর বুক ভরে, বাতাস খেলে তোর মগজ ভরে, তুই আর কী খাস রে, বুধা?

ও প্রবল হাসিতে ভেঙে পড়ে। ততক্ষণ ওর বিস্কুট খাওয়া শেষ হয়েছে। ও চায়ের কাপে চুমুক দেয়। আলি দেখতে পায় তৃপ্তিতে ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। একে-দুয়ে মানুষ এসে বসে। বড় গলায় কথা বলে না। চুপচাপ থাকে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, চোখ ভিজে ওঠে। কারও কারও চোখে আগুনের ফুলকি ছোটে। কেমন করে যে তাকায়, তা বোঝা যায় না। ছেলেটির মনে হয় এ গাঁয়ের কারও এমন দৃষ্টি ও কোনো দিন দেখেনি। মানুষগুলো বদলে যাচ্ছে। একদিন সবাই মিলে অবাক হয়ে শোনে, গাঁয়ে শান্তি কমিটি হয়েছে। আহাদ মুন্সি চেয়ারম্যান। ছেলেটি বুঝে যায় গাঁয়ের মানুষ দুভাগ হয়ে গেছে। এক দল আলির চায়ের দোকানে এসে বসে। নিজেদের মধ্যে কিছু কথা বলতে চায়। অন্য দল আহাদ মুন্সির দলে। মিলিটারির ক্যাম্পের পাশে ঘোরাফেরা করে। আকস্মিকভাবে ও চেঁচিয়ে ওঠে, 'যুদ্ধ, যুদ্ধ!' মানুষ যখন দুভাগ হয়ে যায় তখন তার মধ্য দিয়ে যুদ্ধ নামের নদী বইতে থাকে। এখন থেকে ওর নাম যুদ্ধ। ও নিজের ভেতরে জোশ অনুভব করে। একছুটে বড় সড়কের ধারে আসে। আর একছুটে নদীর ধারে যাওয়ার সময় মুখোমুখি হয় আহাদ মুন্সির।

ও বিনীত ভঙ্গিতে হাত উঠিয়ে বলে, স্লামালেকুম, চেয়ারম্যান সাহেব।

আহাদ মুন্সি বিগলিত হেসে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। ছেলেটির সরল চেহারা দেখে তার মায়া হয়। হাসিমুখে জিজ্ঞেস করে, তোর নামটা যেন কী রে? মনে করতে পারছি না।

আমার নাম যুদ্ধ।

যুদ্ধ? আহাদ মুন্সির চোখ কপালে ওঠে। বলিস কী? তুই কি পাগল নাকি?

পাশে দাঁড়ানো লোকটি ঝটপট বলে, হ্যাঁ, হুজুর একদম পাগল।

আরেকজন বলে, চলেন চেয়ারম্যান সাহেব, ওটা তো একটা পাগল পোলা। ওই যে কলেরায় ওর মা-বাবা সব মরেছে না! এক রাতে সব শেষ। তারপর থেকে ওর মাথার ঠিক নাই।

আহা রে, আসিস আমার বাড়িতে। গরু চরানোর কাজ দেব। পেটেভাতে থাকবি।

কিন্তু একটা কথা, চেয়ারম্যান সাহেব...

কী? কিছু বলবি? টাকা দিতে পারব না, বাপু। আমার পকেটে এখন টাকা নাই।

আমি আপনার কাছে টাকা চাই না। আমি যার-তার কাছে হাত পাতি না।

কী বললি?

বললাম, আপনি তো শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান। কিন্তু সারা দেশে যে অশান্তি। শান্তি কই?

চুপ বেয়াদ্দব!

নাম রাখলেন বেয়াদ্দব? ভালো। কেউ আমার নতুন নাম রাখলে আমি খুব খুশি হই।

'বেয়াদ্দব, বেয়াদ্দব' বলতে বলতে ও পথে নামে। তারপর হা-হা করে হাসতে থাকে। ওর হাসির তোড় আহাদ মুন্সির দুকানভরে বাজে। লোকটি ভুরু কুঁচকে ওর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। যাওয়ার কথা ভুলে যায়।

চেয়ারম্যান সাহেব চলেন।

যাব! আহাদ মুন্সি অন্যমনস্ক কণ্ঠে বলে।

হ্যাঁ, যাবেন তো। একটা বানরের কথায় আপনি এত কী ভাবছেন?

ভাবছি না তো।

তা হলে?

চল যাই।

আহাদ মুন্সি হাঁটতে থাকে। কিন্তু বাকি পথটা সে আর কারও সঙ্গে কথা বলে না।

বিকেলে চায়ের দোকানে বসে থাকার সময় ছেলেটির মনে হয় আলি আর মিঠুকে একদম একরকম লাগছে। দুজনের চেহারায় অদ্ভুত ছায়া খেলছে। ও মনে মনে বলে, আশ্চর্য। আমি যে কথা ভাবছি ওরা ঠিক সে কথাই ভাবছে। কেমন করে এমন ভেতরে ভেতরে এক হয় মানুষ? এক হওয়ার এখনই তো সময়। এক হতে না পারলে এই বিদেশি সৈনিকগুলো ওদের মেরে ভূত বানিয়ে ফেলবে। গ্রামটা হয়ে যাবে একটা শ্মশান। যেখানে মানুষ থাকবে না, থাকবে মানুষের প্রেত। ভাবতে ভাবতে ও হি হি করে হাসে। হাসতে ওর মজাই লাগে।

মিঠু বলে, হাসছিস কেন, বুধা?

ভূত।

আলি ও মিঠু একসঙ্গে বলে, ভূত কী রে?

আমরা লড়াই না করলে গ্রামটা একদিন ভূতের বাড়ি হবে। না, ভুল বললাম। ভূত না, গ্রামটা ভরে যাবে মানুষের প্রেতে। ওরা সংখ্যায় বেশি হবে না। কিন্তু ওদের বড় বড় পা, হাত, মাথা দিয়ে ওরা গ্রামটা ভরে ফেলবে।

কী বলছিস, বুধা?

হি-হি করে হাসে ও। হাসতেই থাকে। আলি বলে, আবার হাসছিস কেন?

আপনাদের দুজনকে একরকম দেখাচ্ছে। আপনারা কী দুজন না, একজন?

তুই তো বেশ ধেড়ে ছেলে রে।

আলি ও মিঠু এবার হাসতে থাকে।

আপনারা হাসেন কেন?

আমরা তোকে বুঝতে পারছি রে।

কেমন?

তোকে ধরলে আমরা এখানে তিনজন। কিন্তু আমরা তিনজন নই, একজন। ঠিক না?

হ্যাঁ ঠিক।

ছেলেটি গম্ভীর হয়ে বলে।

মিঠু জিজ্ঞেস করে, তিনজন একজন হলে কী হয়, জানিস তো?

জানি। শক্তি বাড়ে। বড় শক্তি হয়। এক হলে লড়াইয়ে শত্রুরা হারে।

শাবাশ। তোকে দিয়েই হবে।

ফেরার সময় ছেলেটি আলির কাছ থেকে এক শিশি কেরোসিন চেয়ে নিয়ে আসে। বলে, 'আমি গায়ে খেটে তোমার তেলের দাম শোধ দেব, আলি ভাই।'

ওইটুকু তেলের দাম শোধ দিতে হবে না।

হ্যাঁ, দিতে হবে না। আমরা জানি তুই ভালো একটা কিছু করার জন্য তেল নিয়েছিস। মিঠুকে সমর্থন করল আলি।

দুজনে গভীর চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। ও হেসে মাথা নেড়ে পথে নামে। পোড়া ঘরে ফিরে বুধা বাঁশের লাঠির মাথায় শুকনো পাট জড়িয়ে মশাল বানায়। চারটা মশাল। গভীর রাতে পথে নামে ও। গাছগাছালি, ঝোপঝাড়ের আড়ালে চুপিচুপি আহাদ মুন্সির বাড়ির দিকে এগোয়। গোয়ালঘরের পেছনে কচুর ঝোপ আর কলাগাছের পেছনে বসে শিশির কেরোসিন ঢেলে চারটা মশাল ভিজিয়ে নেয়। তারপর দেশলাই ঠুকে আগুন জ্বালিয়ে বড় মশালটা ছুড়ে মারে আটচালা ঘরের ওপর। একটা কাছারিঘরের ওপর। আর একটা রান্নাঘরে। অন্যটা গোয়ালে। দাউদাউ জ্বলে ওঠে ছনের চালা। মুহূর্তে আগুন ছড়িয়ে যায়। ঘুমন্ত মানুষগুলো জীবন নিয়ে বেরিয়ে আসতে ব্যস্ত। ঘর বাঁচানোর খেয়াল কারও নেই। অল্পক্ষণের মধ্যে বসতবাড়ি পুড়ে সাফ। মশাল ছুড়ে ও আর অপেক্ষা করে নি। সবাই যখন ছোটাছুটি, কান্নাকাটিতে ব্যস্ত তখন ও ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে পালাতে থাকে। অল্পক্ষণে ফিরে আসে পোড়া ঘরে। একটু পর পায়ের শব্দ শুনে ও ফিসফিসিয়ে বলে, কে ওখানে?

জয় বাংলা।

ও বুঝে যায় আলির কণ্ঠ।

আবার ধ্বনি হয়, জয় বাংলা। এটা মিঠুর কণ্ঠ।

জয় বাংলা বলে, ও নিজেও বেরিয়ে আসে। ওরা দুজন জড়িয়ে ধরে ওকে। আলি বড় এক বোতল কেরোসিন ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, এই বোতলটা রাখ। দরকারমতো কাজে লাগাবি। এখন থেকে তোর নতুন নাম জয় বাংলা।

তুই আমাদের শক্তি। আমাদের জয় বাংলা।

জয় বাংলা বলে আমরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

ছেলেটি হি-হি করে হাসে। ওর বুকের ভেতরে প্রাণের জোয়ার। উথাল-পাথাল বয়ে যায়।

হাসছিস যে?

খুশিতে। উহ্ মাগো, এমন খুশি আমার জীবনে আর আসেনি। বাবা-মা-ভাই-বোন মরে যাওয়ার পরে আমি তো জানতামই না যে খুশি কী!

জয় বাংলা খুশি যা হয়েছিস তা ঠিক আছে। তবে ভুলে যাস না যে এখন কাজের সময়।

হ্যাঁ, হ্যাঁ জানি, সামনে আমাদের অনেক কাজ।

কঠিন কাজ।

বড় কাজ।

ও আবার হি-হি করে হাসে। ওর হাসিতে তারার ফুল ফোটে। আলি আর মিঠু মুগ্ধ হয়ে ওকে দেখে।

আমরা চলে যাচ্ছি, জয় বাংলা। আহাদ মুন্সি আমাদের ছাড়বে না। ঠিকই সন্দেহ করবে। আজ রাতেই পালাব। তুই সাবধানে থাকিস। তুই তো ছোট, তোকে এখনই সন্দেহ করবে না।

মিঠু ওকে জড়িয়ে ধরে।

আলি বলে, আমরা মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে যাচ্ছি। ওই মিলিটারি ক্যাম্পটা উড়িয়ে দিতে হবে। সময়মতো আসব জয় বাংলা। তুই ভয় পাস না।

আমি তোমাদের জন্য তৈরি হয়ে থাকব। যখনই আসবে দেখবে আমি রেডি।

শাবাশ। তোকে দেখেই বুঝতে পারছি যে দেশটা স্বাধীন হবে।

তোকে দেখে আমাদের সাহস বেড়ে গেছে। এখন আমাদের মরতেও ভয় নেই।

দুজনে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। ওর মনে হয় অন্ধকার ওদের বুকে টেনে নিল। আড়াল করে দিল সৈনিকগুলোর চোখের সামনে থেকে।

ওরা চলে গেলে সেই রাতে ও আর ঘুমুতে পারে না। কড়ইগাছের নিচে বাঁশের মাচাটার ওপর চিতপাত হয়ে শুয়ে থাকে। আকাশের হাজার নক্ষত্র দেখে। আজ ওরা ওর নাম রেখেছে জয় বাংলা। এক তীব্র আনন্দ ওকে এমন করে ভরিয়ে রাখে যে ও ভুলে যায় দুঃখ-বেদনার কথা। ও ঘুমিয়ে পড়ে।

ভোরবেলা আহাদ মুন্সির বড় ছেলে ওকে কান ধরে টেনে তোলে। ও ঘুম-জড়ানো চোখে মতিউরের দিকে তাকায়।

এই শুয়োরের বাচ্চা, ওঠ।

শুয়োরের বাচ্চা? ও ঠিকমতো চোখ খোলে।

আলি কোথায়?

জানি না।

তুই জানিস, বল?

কেমন করে জানব? আলি আমার কে? ও কি আমার মায়ের পেটের ভাই?

ইস, ঢং দেখানো হচ্ছে। একটা পিচ্চি শয়তান।

আমাদের বাড়িতে আগুন দিয়েছে কে?

আগুন!

আগুন কী জানিস না? মতিউর রেগেমেগে ওকে থাপ্পড় দেওয়ার জন্য হাত ওঠানোর সঙ্গে সঙ্গে ও দু-পা পিছিয়ে গিয়ে আগুন আগুন বলে চিৎকার করতে করতে নদীর ঢালু বেয়ে নেমে যায়। অনেকখানি নেমে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে তাকায়। দেখে মতিউর একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ও ওর আচরণের হদিস করে উঠতে পারে না। ছেলেটি ওর দিকে তাকিয়ে জিব বের করে ভেংচি কাটে। তারপর কাকতাড়ুয়া সেজে দাঁড়িয়ে থাকে। মতিউর নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে ওকে গালাগাল করে, তোর সামনে খারাপ দিন আছে, বুধা। তোকে পেলে আমি চিবিয়ে খাব। বান্দর একটা। মনে রাখিস–

মতিউরের হম্বিতম্বিতে লোক জড়ো হয়।

একজন বলে, ওকে মাফ করে দেন। ওর কি মাথা ঠিক আছে। বাপ-মা মরা।

আরে রাখেন বাপ-মা মরা। বাপ-মা যেন আর কারও মরে না।

মতিউর প্রচণ্ড রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে চলে যায়। বুধা নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকে। ওর ঘাড় কাত করা। মাথার ওপর শুকনো পাতা ঝরে পড়ে। কেউ জানে না ও কখন ওর কাকতাড়ুয়া ভঙ্গি থেকে সরে আসবে।

পরদিন গাঁয়ের রাজাকার কমান্ডারের বাড়িতে আগুন লাগে। পুড়ে যায় সবগুলো ঘর। শুধু মানুষের জীবন বাঁচে, আর গরু-ছাগলগুলো বাঁচানো যায়। কোথা থেকে কীভাবে আগুন লাগল— হদিস করতে পারল না বাড়ির লোকজন।

২০১৮

রাজাকার কমাণ্ডার কাজের মেয়েটিকে আচ্ছা করে পিটিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিল। তার ধারণা, কাজের মেয়েটি রান্না করার পরে নিশ্চয় পাঠখড়িগুলো চুলোর পাশে রেখে দিয়েছিল। সেখান থেকে আগুন লেগেছে। বাড়ির বাইরের জামগাছের নিচে বসে মেয়েটি অনেকক্ষণ কাঁদল। বুধা মেয়েটিকে দুটো জিলাপি দিয়ে বলল, খা।

মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি পাটখড়ি চুলার পাশে রাখিনি, বুধা। আমি জানি না কীভাবে আগুন লাগল।

বুধা ওর পাশে বসে। তারপর কোমরে গুঁজে রাখা মলমের ছোট্ট কৌটাটা ওর হাতে দিয়ে বলে, যেখানে যেখানে কেটেছে সেখানে লাগিয়ে দে।

মলম?

হ্যাঁ, তোর জন্য এনেছি। রাজাকার কমাণ্ডার যখন তোকে মারছিল তখনই বুঝেছিলাম যে এই মলমটা তোর লাগবে। লাগিয়ে দে জ্বালাপোড়া কমবে। আহা রে যুদ্ধের জন্য আমাদের কত কিছু সইতে হয়।

যুদ্ধ! মেয়েটি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকায়। যুদ্ধ কোথায়? আগুন লাগা কি যুদ্ধ?

ধর,এক রকম তাই। আমি এমনি বললাম। তোর নাম কী রে?

ফুলকলি।

চল আমার সঙ্গে।

কোথায়?

আতা ফুপুর বাড়িতে। ওখানে গিয়ে একটু ঘুমিয়ে থাকবি।

এখন গেলে ওরা আমাকে মারবে।

মারবে না। এরা এখন ঘর-দুয়ার নিয়ে ব্যস্ত। এদের মেজাজ ঠাণ্ডা হোক, তারপরে আসবি। তোর তো কেউ নেই। কোথায়ই বা যাবি। আয়।

বুধা ফুলকলির হাত ধরে টানে। দুজনে সবার চোখ এড়িয়ে পথে নামে। যেতে যেতে ছেলেটি বলে, তোর কি খুব কষ্ট হচ্ছে, ফুলকলি?

মলম লাগানোর পর জ্বালা কমেছে।

যুদ্ধের সময় কত জ্বালা যে সইতে হয়।

তুই বারবার যুদ্ধের কথা বলছিস কেন?

তুই কি যুদ্ধ করছিস?

হ্যাঁ।

কার সঙ্গে?

শত্রুর সঙ্গে।

শত্রু! তাহলে তুই-ই কি আগুন...

আগুন! আগুন! আমাদের চারদিকে আগুন। আয় দৌড়াই।

বুধা ফুলকলির হাত ধরে হেঁচকা টান দেয়। মেয়েটি হোঁচট খেতে খেতে সামলে নেয়।একসময় দম নেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে বলে, আমি সব বুঝতে পেরেছি, বুধা। আমি তোর শত্রু নই।

আমি তো জানি তুই আমার শত্রু নস্। আমরা দুজনে এক। ওই বাড়িতে কিছু ঘটলে আমি তোকে জানিয়ে দেব।

ফুলকলি এখন থেকে তোকে আমি জয় বাংলা ডাকব।

জয় বাংলা, জয় বাংলা। জয় বাংলা, জয় বাংলা বলতে বলতে ফুলকলি আবার ছুট দেয়। এবার ওদের দম ফুরোয় না। ওরা একদৌড়ে আতা ফুপুর বাড়িতে এসে ওঠে। ফুলকলি ফিসফিসিয়ে বলে, এখন থেকে তোকে আমি যুদ্ধ ডাকব, বুধা।

ডাকিস, তবে একা পেলে। সবার সামনে ডাকিস না।

আচ্ছা। ফুলকলি ওর দিকে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকায়। বুধা চেঁচিয়ে ডাকে, ফুপু, ফুপু। আমি এসেছি।

খুব ভালো করেছিস। ওমা ফুলকলি যে? তোদের বাড়িতে আগুন লেগেছে না?

মালিক ওকে খুব মেরেছে, ফুপু। তোমার হাঁড়িতে পান্তা আছে, ফুপু? আমাদের খেতে দাও।

সেদিন ভোরবেলা আতা ফুপুর রান্নাঘরে বসে পেট ভরে পান্তা ভাত খায় ও। কী আনন্দ! অনেক দিন পরে আতা ফুপুর উঠোনে ও কাকতাড়ুয়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বোলতাটা কানের পাশ দিয়ে উড়ে গেলে মনে হয় বোলতার ডাকের ভেতর থেকে অদ্ভুত শব্দ ভেসে আসছে। শব্দটা অন্য রকম। আগে শোনেনি। এটা কি যুদ্ধের শব্দ? রাইফেলের শব্দ ও চিনে গেছে। মেশিনগান কেমন তাও জানে। এসব মিলিয়ে যে শব্দ হয়, সেটাই বুঝি যুদ্ধের শব্দ। কাছ থেকে এই শব্দটি ওর শোনা হয়নি। ঠিক সে সময় রাজাকার কুদ্দুস ওর সামনে এসে দাঁড়ায়।

তোর মনে কি খুব আনন্দ? কাকতাড়ুয়া সেজেছিস কেন?

ও হি-হি করে হাসে। হাসির তোড়ে ওর কাকতাড়ুয়া ভঙ্গি আর ঠিক থাকে না। ওর শরীরে ঝাঁকুনি ওঠে।

হাসছিস কেন? তোর হয়েছে কী? কমান্ডারের বাড়ি পুড়েছে তাতে গাঁয়ের মানুষ সবাই দুঃখ করছে। আর তুই হাসছিস? ঢং করে আবার কাকতাড়ুয়া সাজা হয়েছে!

হাসব না কেন? কাকতাড়ুয়াকেও মানুষের মতো লাগে যে।

বানর একটা।

ঠিকই, তোমার মতো। আমি তোমার মতো হয়েছি। কী আনন্দ ধেই, ধেই। নৌকা চালাও হেঁইও।

কুদ্দুস কষে থাপ্পড় মারার জন্য হাত তোলার আগেই ও লাফ দিয়ে সরে যায়।

হাতের কাছে পেলে তুলে একটা আছাড় মারব, শয়তান। মিঠু কোথায় বল?

নদীর তলে খুঁজে দেখ। আমাকে জিজ্ঞেস কর কেন? আমি কি ওদের গাজ্জিয়ান?

শুয়োরের বাচ্চা।

মেশিনগান বল, আমার নাম মেশিনগান।

হারামজাদা।

কুদ্দুস ওকে তাড়া করে। ও লাফ দিয়ে ছোটে। কচুরিপানাভরা পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে একডুবে ওপারে গিয়ে ওঠে। মাথার সঙ্গে লেগে থাকে কচুরিপানা। ওকে অন্য রকম দেখায়। ও মাথা থেকে কচুরিপানা সরায় না। ভাবে, ফুলকলি সামনে থাকলে হেসে গড়িয়ে পড়ত। বলত, তুই একটা ভাল্লুক। থলথলে চর্বিভরা শরীর। ফুলকলির অনেক দুঃখ। দেশটা স্বাধীন হলে ফুলকলির আর দুঃখ থাকবে না। ওর ভেতরে দেশ স্বাধীন করার জোশ জেগে ওঠে।

পরদিন অনেক রাতে একজন মুক্তিযোদ্ধা আসে ওর কাছে। চুপিচুপি ডাকে, জয় বাংলা।

ওর সাড়া নেই। ঘুমে নিঃসাড়। ঘুমের ভেতরে স্বাধীনতার স্বপ্ন ওকে এক আশ্চর্য দেশে নিয়ে যায়। সেখানেও ও আর ফুলকলি হাত ধরাধরি করে হাঁটছে। চারদিকে ফুল-পাখিতে ভরা। হাজার প্রজাপতি উড়ে বেড়ায়। ও ধরার জন্য চেষ্টা করে, কিন্তু ধরতে পারে না। অন্যদিকে ফুলকলি শত শত প্রজাপতি ধরে ওর কোঁচড় ভর্তি করে ফেলে। ফুলকলি উজ্জ্বল মুখে ঘুরে বেড়ায়। তারপর একসময় ওর কাছে এসে বলে, বুধা, এ সব প্রজাপতি তোর জন্য। তুই যে আমার জন্য একটা যুদ্ধ জিতেছিস।

ও চেঁচিয়ে বলে, আমি জিতেছি?

হ্যাঁ রে জিতেছিস। দেখ চারদিকে কেমন বাজি ফুটছে। দেখ তোর মাথায় আমি প্রজাপতি ছড়িয়ে দিচ্ছি।

ও দেখতে পায় ওর পুরো শরীরে প্রজাপতি জামার মতো সেঁটে আছে। ও ভীষণ খুশি হয়ে একটি প্রজাপতি ধরে আকাশে ওড়াতে থাকে। ফুলকলি হাততালি দেয়।

তখন ওর ঘুম ভেঙে যায়। কে যেন ওকে ডাকছে।

বঙ্গবন্ধু? এই মেশিনগান?

ও ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। আশ্চর্য, ঘরে এত আলো কেন? রাত না দিন?

এই যুদ্ধ উঠে আয়। কি রে তোর ঘুম কি ভাঙেনি? আমার ডাক কি তোর কানে পৌঁছাচ্ছে না?

আশ্চর্য, কার কণ্ঠ? বোলতাটা কি কানের পাশ দিয়ে উড়ে গেল? ওর চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে, আমি তো তোমাদের জন্য বসে আছি। এত দিন আসোনি কেন? আমার কাছে পৌঁছাতে তোমাদের এত সময় লেগেছে কেন?

চুপ করে আছিস কেন, কাকতাড়ুয়া?

ও হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসে। ওকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরে মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দিন। শাহাবুদ্দিন তো ছবি আঁকে। আর্ট কলেজে পড়ে। তা হলে শাহাবুদ্দিনও যুদ্ধ করছে। ওহ্ যুদ্ধ, যুদ্ধ।

বুধা শাহাবুদ্দিনকে স্যালুট করে। শাহাবুদ্দিন ভুরু কুঁচকে বলে, কি রে স্যালুট করলি কেন?

আপনি তো মুক্তিবাহিনীর কমাণ্ডার। স্যালুট করব না? কী যে বলেন?

ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুই একটা বাহাদুর ছেলে আমি শুনেছি।

ছেলেটি হাসতে থাকে। তারপর শাহাবুদ্দিনের হাত ধরে মাচানের ওপর এসে বসে।

আলি আর মিঠুর কাছে তোর কথা শুনেছি। তুই তো এই গাঁয়ে একাই যুদ্ধ করছিস।

যুদ্ধ? আমি?

হ্যাঁ রে। ওই যে বাড়িগুলো পুড়িয়েছিস, এটাও যুদ্ধ। এবার বড় যুদ্ধ করতে হবে।

সেটা কী?

মিলিটারির ক্যাম্পটা উড়িয়ে দেব আমরা। তুই থাকবি আমাদের সঙ্গে।

রেকি করার কাজটা তোকে করতে হবে।

এ আর এমন কী কঠিন কাজ, খুব পারব।

জানি তো তুই পারবি। শোন কয়টা সেপাই পাহারা দেয়, কয়জন তাঁবুর ভেতর থাকে, মেশিনগানটা কোথায় ফিট করে রেখেছে—সব খবর নিয়ে আসবি। আমি আবার দুদিন পরে আসব। যা ঘুমিয়ে পড়।

কীভাবে ফিরবেন?

নৌকায় নদী পেরিয়ে চলে যাব। ভয় পাস না।

ছেলেটি আবার নিজের খড়ের বিছানায় ফিরে আসে। গুটিসুটি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমুনোর আগে ওর মনে হয়, ভয় কী সে তো ও কবেই ভুলে গেছে। নতুন করে আর ভয়ের কী আছে ওর জীবনে। এখন তো ওর জীবনের চারদিকে তাক-ডুমা-ডুম ঢোল বাজছে। এই বাজনার নিচে ওর ভয় চাপা পড়ে গেছে। ওকে আর ভয়ের ভূত ধরতে পারবে না; বরং ও এখন ওর শৈশবের আনন্দের দিনগুলো খুঁজে পায়। যখন বাবা-মা বেঁচেছিল সে সব দিন। কত দিন বাবার সঙ্গে হাটে গিয়েছে। ইলিশ মাছ কিনেছে। মা রান্না করেছে। ইলিশের গন্ধে ওর ভাইবোনেরা বসে থাকত চুলোর পাশে। শীতকালে মা ভাপা পিঠা বানাত। কী আনন্দের ছিল সে সব দিন। স্বাধীনতার স্বপ্নে ও আবার সে সব দিনের আনন্দ ফিরে পেয়েছে। এখন ওর আর কোনো ভাবনা নেই। মরণেও ভয় নেই।

পরদিন ও একগাদা পেয়ারা নিয়ে মিলিটারি ক্যাম্পে যায়। গাঁয়ের স্কুলঘরটি দখল করে ওরা ক্যাম্প বানিয়েছে। সামনের মাঠে বেশ কতগুলো তাঁবু টাঙানো। ও এত দূর থেকে তাঁবু দেখতে পায় না। কিন্তু দৃশ্যটি ওর মাথায় আছে।

২০১৫

সেটা পরিষ্কার। দুপাশের ধানখেতের ভেতর দিয়ে সোজা চলে যাওয়া লম্বা পথটা পেরিয়ে ডান দিকে এগোলে স্কুলঘর। মা-বাবা মরে যাওয়ার পর থেকে ওর স্কুল বন্ধ। এর মধ্যে দুই বছর পেরিয়েছে। স্কুলের স্মৃতি ও মনে করতে চায় না। ওটা বুকের ভেতর বন্ধ করে রেখেছে। চমৎকার নকশা করা রঙিন একটা বাক্স আছে বুকের ভেতর। গত দুই বছরে সে বাক্স খোলার ইচ্ছে ওর হয়নি। এখন ওই স্কুলের দিকে যত এগোচ্ছে ততই মাথার ভেতর বোলতার শব্দ তীব্র হয়ে উঠছে। দুই বছরে কত হাজার বার স্কুলের আশপাশে ঘুরেছে। স্কুলের মাঠে ফুটবল খেলেছে। রাতে স্কুলের বারান্দায় ঘুমিয়েছে, আর দুকান ভরে শুনেছে ঘণ্টার ঢং ঢং শব্দ। আশ্চর্য! মাথার ভেতর প্রবল শ্রাবণ মাস। রাতভর বৃষ্টি। ও ডান হাতের ওপর মাথা রেখে স্কুলের খেলার মাঠের দিকে তাকিয়ে শুয়ে আছে। কঠিন রাত। শেষ হবে না বুঝি। সেদিন ওর কেয়ামতের দিনের কথা মনে পড়েছে। মৌলবি সাহেব বলেছেন, কেয়ামতের দিন মাথার এক হাত ওপরে সূর্য নেমে আসবে। এমন বৃষ্টিমুখর শ্রাবণের রাতে ওর কেয়ামতের দিনের সূর্যের কথা মনে পড়ছে কেন? সূর্য কি শব্দ করে? বৃষ্টির শব্দ নয়, চারদিকে তুমুল ঘণ্টাধ্বনি। ঢং-ঢং-ঢং। কবেই তো স্কুলের দিনগুলো শেষ হয়ে গেছে। তুমুল ঘণ্টধ্বনি কেন ওকে টানে? শ্রাবণ মাসের প্রবল বৃষ্টি ওর দুচোখ বেয়ে গড়াতে থাকে। ও মোছে না।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এই প্রথম স্কুলের দিকে যাচ্ছে। মাথার ওপর খাঁ-খাঁ দুপুর। চড়া রোদ। ও জানে, এই যুদ্ধের সময় আবার শ্রাবণ মাস এসেছে। বৃষ্টি নেই। চড়া রোদে ওর শরীর ঘামতে থাকে। জামার পকেটে পেয়ারা। কোমরে গোঁজা পেয়ারা। ডাঁসা। ও ভাবে, একটি পেয়ারা কি খাবে? ভাবতে ভাবতে অনেকটা পথ চলে আসে। পেয়ারাগুলো তো হাতে বন্দুক নিয়ে লোহার টুপি মাথায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর জন্য নিয়েছে। ওদের সঙ্গে পেয়ারা খাওয়ার আড্ডা জমিয়ে তুলবে বলেই না এত ডাঁসা পেয়ারা সংগ্রহ করা।

নদীর ধারে গাছগুলোর পেয়ারা খেয়েই তো ওর রাত কেটে যায়। ও বেশ গান গাইতে গাইতে এগোতে থাকে। এগোতে এগোতে চঞ্চল হয়ে ওঠে। আশ্চর্য, এত কাছ থেকে সৈনিকগুলোকে ওর দেখা হয়নি। ওদের চোখে চোখ পড়লে ওর দৃষ্টি কেঁপে ওঠে না। ও বুঝে যায় প্রাণহীন দৃষ্টি। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। যে দৃষ্টিতে ভাষা থাকে না, সে রকম দৃষ্টিহীন মানুষকে ওর মানুষই মনে হয় না।

ক্যাম্পে পৌঁছে ও প্রথমে নিজে একটি পেয়ারায় কামড় দেয়। আরেকটি পেয়ারা এগিয়ে দেয় প্রথম সৈনিকটির দিকে। ইশারায় বলে, খাবে?

লোকটি দাঁত কেলিয়ে হেসে পেয়ারাটা ছোঁ মেরে নিয়ে নেয় ওর হাত থেকে। কামড় দিয়ে বলে, বহুত আচ্ছা, বহুত মিঠা। আওর হ্যায়?

ছেলেটি সবগুলো পেয়ারা বের করে মাটিতে ফেলে দেয়। আশপাশ থেকে আরও দু-চারজন সেপাই এগিয়ে আসে। দুজন পেয়ারাগুলোর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ভালোগুলো বাছতে থাকে। তিন-চারটে তুলে নিয়ে একজন জিজ্ঞেস করে, তুমকো নাম কেয়া?

ও বিগলিত হেসে উত্তর দেয়, কাকতাড়ুয়া।

কেয়া বাত? কাক...। বাকিটুকু আর উচ্চারণ করতে পারে না। হেসে গড়িয়ে পড়ে সবাই। একজন ওর পিঠ চাপড়ে দেয়। ও ওদের পাশে পা ছড়িয়ে বসে চারদিকে দেখতে থাকে। ক্যাম্পের প্রতিটি জায়গা ও ক্ষিপ্র দৃষ্টিতে পরিমাপ করে। লোকগুলো বেশ মনোযোগ দিয়ে পেয়ারা খাচ্ছে। রোদে-গরমে ওদের গাল বেয়ে ঘাম গড়াচ্ছে। ওর হাসি পায়। হা-হা করে হাসতে থাকে। ঠিক সেই মুহূর্তে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আহাদ মুন্সি ওর সামনে এসে দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে, এই বেয়াদব, হাসছিস কেন?

লোহার টুপি কি মানুষের মগজ খায়?

কী বললি? আহাদ মুন্সি ভুরু কুঁচকে তাকায়।

ও আবার একই কথা বলে। আহাদ মুন্সির চোখ লাল হয়ে ওঠে।

সেদিনও তুই আমার সঙ্গে বেয়াদবি করেছিলি। আজও করলি। তোর নাম কী?

কাকতাড়ুয়া।

কাকতাড়ুয়া! ঠিক করে বল?

কাকতাড়ুয়া।

বলতে বলতে ও হেসে গড়িয়ে পড়ে। তারপর সুর করে বলতে থাকে, লোহার টুপি মানুষ খায়, মানুষ খায়...।

আহাদ মুন্সি চেঁচিয়ে ওঠে, পাগল না ছাই। আস্ত বদমাশ একটা। এই, ওকে কাকতাড়ুয়া বানিয়ে রাখ।

আহাদ মুন্সির সঙ্গে তিনজন রাজাকার ছিল। ওরা খুব মজা পায়। শক্ত করে দুহাত চেপে ধরে দু-চারটে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, আর বদমাশি করবি তো জানে মেরে ফেলব। ঘুঘু দেখেছ, কিন্তু ফাঁদ দেখনি, চাঁদ।

ওরা ওকে কাকতাড়ুয়া বানানোর উৎসবে মেতে ওঠে। হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে চায় মাঠের মাঝখানে। ও এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছ কেন? আমি তো হেঁটে যেতে পারি। ভয় পেয়ে আমি পালাই না।

ইস, বড় বড় কথা।

বলবে না। বাপ-মা-ভাইবোন সব তো খেয়েছে।

খবরদার বাজে কথা বলবে না।

ইস, নবাব। নবাব হয়েছে। মারব এক থাপ্পড়।

মারো না মেরেই ফেল। লোকে জানুক যে আমি স্বাধীনতার যুদ্ধে শহিদ হয়েছি।

কী বললি?

যা বলেছি তা তো দুকান দিয়ে শুনেছই। আবার কী?

তখন একজন ওর গালে ঠাস করে চড় মারে। ও রুখে দাঁড়িয়ে বলে, আমি শোধ নিতে জানি।

আবার কথা।

দুজনে ওর দুহাত চেপে ধরে। অন্য জন পা ধরে চ্যাংদোলা করে নেয়। ও বলে, তিনজনে মিলে একজনকে মারছ লজ্জা করে না?

লজ্জা কিসের? মেরে ভূত করে ফেলব। তখন বুঝবি। আজ ছেড়ে দিলাম। বাপ-মা মরা ছেলে বলে রেহাই পেলি।

ওরা ওকে মাঠের মাঝখানে এনে ধাম করে ফেলে দেয়। ও নড়েচড়ে না। উঠে দাঁড়ায় না। চিত হয়ে শুয়েই থাকে। চোখ বোজা। ওরা মাঠের মাঝখানে একটি বাঁশ পুঁতে বাঁশের সঙ্গে শরীরটা বাঁধে। আর একটি বাঁশের ওপর রাখে ওর ডান হাত। অন্যটিতে বাঁ হাত। ওর গায়ের জামাটা বেঁধে দেয় মাথায়। তারপর রান্নাঘর থেকে হাঁড়ির নিচের কালি এনে মুখে লাগায়। বুক-পিঠও আঁকাবাঁকা রেখায় ভরিয়ে দেয়। তারপর হি হি করে হাসতে হাসতে তিনজন রাজাকার চলে গেলে ওর চোখ জ্বলে ওঠে। কাঠফাটা রোদের দারুণ গরমে সেপাইগুলো দেখতে পায় ওর জ্বলে ওঠা চোখ। কিন্তু ওরা সে চোখের ভাষা বুঝতে পারে না। ভাবে, রোদে ছেলেটির খুব কষ্ট হচ্ছে।তা ছাড়া একটু আগে ওর দেওয়া পেয়ারা খেয়ে ওদের খুব মায়া হয়েছে। ওরা ওর নতুন ভঙ্গি দেখে। এভাবে কাউকে শাস্তি দেওয়া যায়,এটা ওদের ধারণায় নেই। ওরা জানে গুলি করতে, জানে যে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলতে। তাই শাস্তির এই নতুন ঢংটায় ওরা মজাই পায়। অনেকক্ষণ ধরে ওকে দেখে। পেয়ারা খাওয়ার কৃতজ্ঞতায় ওর শাস্তি মওকুফ করে দেওয়ার কথা ওদের মনেই আসে না। ছেলেটির ভাষায়, লোহার টুপি ওদের মগজ খেয়েছে। সন্ধ্যার সময় ওরা ছেলেটির বাঁধন খুলে দিয়ে বলে, ভাগ হিঁয়াসে।

ও ভাগে না। ওরা যেভাবে ভাগতে বলেছে, তার মানে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পেরিয়ে যেতে হবে ক্যাম্পের সামনের মাঠটি। সেটা ও করতে পারবে না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে,এখানে ওকে আবার ফিরে আসতে হবে। ও খুব শান্ত পায়ে হেঁটে মাঠটা পার হয়। হাঁটতে কষ্ট হয়। মাথা ঝিমঝিম করে। কিন্তু শরীরের কষ্টটা তেমন নয়, ভেতরে সুখের

পুঁটিমাছ রুপালি ঝিলিক তুলে সাঁতরায়। কত দিন আগে জেলেদের নৌকায় মাছ ধরতে গেলে জালভরা রুপালি পুঁটি দেখে ওর এমন আনন্দ হয়েছিল। কী আশ্চর্য, কোনো কোনো দৃশ্য কখনো মুছে যায় না। কোনো কোনো দৃশ্য অন্য আরেকটি ঘটনার রেশ ধরে হুবহু তেমন আনন্দ বা দুঃখ তৈরি করে। ও বুঝে যায়, আজ রাতে ওর পোড়া ঘরে একটি মশাল তৈরি হবে। সেটি পুড়িয়ে দেবে আহাদ মুন্সির নতুন তোলা ছনের ঘর।

পরদিন সকালে সেই তিন রাজাকার যখন ওকে খুঁজতে আসে, দেখতে পায় প্রবল জ্বলে ও কোঁকাচ্ছে। মা, মা বলে চিৎকার করছে। পানি খেতে চাইছে। খড়ের বিছনায় গড়াচ্ছে বলে খড়ের কুটো লেগে যাচ্ছে ওর গায়ে। ওকে ভয়ানক জীবের মতো লাগছে। কিম্ভূতকিমাকার। ওর পাশে কেউ নেই। নেড়ি কুকুরটা মাচানের নিচে চিত হয়ে শুয়ে আছে। চারদিকে সুনসান। ওদের ভয় করে। ওরা ওকে ডাকতে সাহস পায় না। ভাবে, ওকে ডাকলে ওর ভূতটা ওদের কাঁধে লাফিয়ে চড়বে। মেরেও ফেলতে পারে ওদের। ওরা দ্রুত পায়ে পালিয়ে যায়। একজন বলে, ছেলেটি শুধু পাগল নয়, আজ ওকে একদম ভূতের মতো লাগছে। কালি মাখানো মুখটা দেখে আমার গা ছমছম করছিল।

ঠিক বলেছিস। আমারও ভয় করছিল। তা ছাড়া ছেলেটা কেমন করে যে কথা বলে। শুনলে গা হিম হয়ে যায়। আমার গায়ে কাঁপুনি ওঠে।

ওই ভূতটার তো জ্বর। তা হলে চেয়ারম্যানের বাড়িতে আগুন দিল কে? আরেকজন রাজাকারের প্রশ্ন। ওর চেহারায়ও ভয়ের চিহ্ন। তিনজনে ভয়ে কাবু হয়ে গেছে।

অন্যজন বলে, রাতের বেলা নিশ্চয় মুক্তিবাহিনীর কেউ আসে। আমি এখন বুঝে গেছি। আমাদের আরও জোরদার ব্যবস্থা নিতে হবে।

ঠিক বলেছিস। আমারও তাই মনে হচ্ছে। আমরা আরও সতর্ক না হলে মুক্তিবাহিনী আমাদের মেরে ফেলবে। দিন দিন ওদের দাপট বাড়ছে।

আমার মনে হয় বুধারও মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগ আছে।

আরে ধুরো, ওইটুকু ছেলেকে কে পাত্তা দেবে। ও কি বন্দুক চালাতে জানে? নাকি গ্রেনেডের পিন খুলতে শিখেছে?

শুনলি না সেদিন কীভাবে শহিদ হওয়ার কথা বলল।

বাপ-মা নাই তো এ জন্য মরণে ভয় নাই। পাগল।

আমার মনে হয় না ছেলেটা অত পাগল।

জ্বর হয়েছে। পাশে তো কেউই নাই। দেখিস আজ রাতে ওটা মরবে। জ্যান্ত থাকতেই তো ও ভূত হয়েছে।

ঠিক বলেছিস। তিনজনে হা-হা করে হাসতে হাসতে দ্রুত পায়ে হেঁটে চলে যায়। দুদিন পর গভীর রাতে একজন ওকে ফিসফিসিয়ে ডাকে, যুদ্ধ ও যুদ্ধ? জয় বাংলা? বঙ্গবন্ধু?

ও চমকে উঠে বসে। এত নামে ওকে ডাকলে ওর সব দুঃখ ধুয়ে যায়। যে নদী দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের নৌকা দ্রুত বেগে চলে যায়, সে নদীটা এমন একটা নামের নদী হয়। নদীর নাম যমুনা, করতোয়া, না পদ্মা, সেটা ও ভাবতে চায় না। ভাবে, নদীর নাম জয় বাংলা বা বঙ্গবন্ধু হলে ক্ষতি কী?

ও দুই লাফে উঠে বাইরে আসে।

কেমন আছিস মানিকরতন?

ভালো। শাহাবুদ্দিন ভাই তুমি কেমন আছ?

তোর জ্বর ভালো হয়েছে রে?

ও হেসে ওঠে, ওটা তো ভাল্লুকের জ্বর। যায় আর আসে। যুদ্ধের সময় কি জ্বরের কথা এত ভাবলে চলে?

না, না ভাবতে হবে। সুস্থ না থাকলে যুদ্ধ করবি কীভাবে? শরীরের তো শক্তি চাই। ঠিক বলিনি?

বলেছ। তুমি ছবি আঁকার মানুষ। তুমি তো ঠিকই বলবে।

সেদিন তোর খুব কষ্ট হয়েছিল, না রে?

যুদ্ধ করতে তোমাদের কি কষ্ট হয়?

না তো। কষ্ট হবে কেন?

তাহলে আমার কষ্ট হবে কেন?

শাবাশ।

এবার কী করতে হবে, বলো।

শুনেছি,ওরা একটা বাঙ্কার করবে। ক্যাম্পে বাঙ্কার করে ফেললে ওদের হারিয়ে দেওয়া কঠিন হবে।

তার আগেই ক্যাম্পটা উড়িয়ে দিতে হবে। এই তো?

হ্যাঁ। আমি একটা মাইন নিয়ে এসেছি। যেদিন বাঙ্কারটা বানাবে সেদিন তোকে মাটিকাটার দলের সঙ্গে কাজ করতে হবে। কাজ শেষ হলে যেভাবে হোক এই মাইনটা মাটির নিচে রেখে আসতে হবে। পারবি তো?

এ আর এমন কী কঠিন কাজ। খুব পারব।

সাবধান!

হি-হি করে হেসে গড়িয়ে পড়ে ও।

হাসছিস যে?

হাসব না তো কী! তোমার কথা শুনে তো হাসি পায়।

তুই কি জানিস, সাবধানে থাকাটা মুক্তিযুদ্ধের কৌশল?

জানি। আচ্ছা বলো তো ওরা বাঙ্কার করবে কেন?

ওরা বুঝতে পেরেছে যে নদীপথে এসে আমরা আক্রমণ করতে পারি। তা এমন সতর্ক ব্যবস্থা।

ও আবার হেসে গড়িয়ে পড়ে। হাসতে হাসতে ওর পেটে খিল ধরে। ওর হাসির শব্দে শাহাবুদ্দিন ভয় পায়। মনে হয়, ছেলেটা বেশি সাহস করছে। শাহাবুদ্দিন তখনই সিদ্ধান্ত নেয় যে, দেশ স্বাধীন হলে ও ছেলেটির একটি ছবি আঁকবে। না, একটি নয়, অনেকগুলো। যুদ্ধরত ছেলেটির নানা ভঙ্গির ছবি।

যুদ্ধ, এমন করে হাসিস না রে।

তুমি আমাকে হাসতে মানা করো না। তুমি চলে গেলে আমি একাই হাসব।

না, একা একা হাসিস না। তুই আমার সামনে বসে হাসবি। আমি তোর একটি ছবি আঁকব। সাহসী ছেলের ছবি।

তুমি আর এখানে বেশিক্ষণ থেকো না, শাহাবুদ্দিন ভাই।

শোন, পরশু দিন সন্ধ্যায় আমি নৌকা নিয়ে তৈরি থাকব। ক্যাম্পটা যখন মাইন ফেটে হাউইবাজির মতো ছিটকে উঠবে, তখন আমরা নদীপথে সরে পড়ব।

ছেলেটি আবার হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে বলে, ভারি মজার খেলা।

যাই রে, জয় বাংলা।

এসো। সাবধান। আবার দেখা হবে।

শাহাবুদ্দিন অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। ছেলেটি মাচার ওপর গালে হাত দিয়ে বসে থাকে। বাকি রাত ওর আর ঘুম আসে না।

পরদিন ও ক্যাম্পে যাওয়ার পথের ধারে বসে থাকে। কখন মাটি কাটার দল আসবে? ও ঘোরাফেরা করে। ফড়িং ধরে। ঘাসের কচি ডাঁটা চিবোয়। ডোবা থেকে পানি তুলে খায়। কিন্তু সেদিন মাটি কাটার দল আর আসে না। দুপুরের পর রোদ কমে গেলে ও গুটিগুটি পায়ে মিঠুদের বাড়িতে হাজির হয়। রান্নাঘরের বারান্দায় পা গুটিয়ে বসে বলে, খালা, আমার খিদে পেয়েছে। সারা দিন খাইনি।

তোকে কত বলি রোজ এসে ভাত খেয়ে যাবি। কেন যে তুই আসিস না। আমার সামনে বসে তোকে ভাত খেতে দেখলে আমার কষ্ট কমে যায়। বুকের শূন্য জায়গাটা ভরে ওঠে। মনে হয়, এই বুঝি দেশটা স্বাধীন হলো।

ও মৃদু হাসে। মিঠুর মা ওকে সানকিভরা ভাত দেয়। সঙ্গে বেগুন দিয়ে ট্যাংরা মাছের তরকারি। উহ্ কী মজা, কী আনন্দ! ও হাপুস-হুপুস খায়। মিঠুর মা দেখতে পায় ওর চোখে তারার আলোর ফুলকি। বলে, ছন্নছাড়া, আমার মধুকে তো পাকিস্তানিরা মেরে ফেলল। মিঠুও বাড়ি ছেড়েছে। মেয়েটা শ্বশুরবাড়িতে থাকে। তোকে পেলে তোর খালু আর আমি দুঃখ ভুলব। এখন থেকে তোকে আমি মধু বলে ডাকব, কেমন?

ও একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, শুধু মধু না, শহিদ মধু।

শহিদ মধু? ও আমার মধু রে... বলে মিঠুর মা কাঁদতে শুরু করে। এ শুধু কান্না নয়, একে বলে গগনবিদারী চিৎকার। যাদের ছেলেরা শহিদ হয় — এ চিৎকার শুধু তাদের বুক ফুটো করে বেরিয়ে আসে। আর কারও কণ্ঠ এমন ধ্বনি ওঠাতে পারে না। ওর আর ভাত খাওয়া হয় না। ও থালা নিয়ে উঠে আসে। ঘরের পেছনে এসে ভাতগুলো ছিটিয়ে দেয়। কাকেরা উড়ে আসে।

ভাতের দানা তুলে নিতে থাকে ঠোঁটে। ও নিজেকে বলে, কী সুন্দর দৃশ্য! কাকেরা ভাত খেলে শহিদের মায়েদের বুক জুড়ায়। দেশ থেকে বর্গি পালায়। শহিদের মায়েরা কাকেদের ডানায় ভর করে উড়াল দিতে থাকে স্বাধীনতার খবর হাটে-ঘাটে-বাটে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। ও আবারও বলে, কী সুন্দর দৃশ্য। যখন ও পুকুরের ঘাটে বসে সানকিটা ধুয়ে নেয়,তখন বুঝতে পারে খালার কান্না থেমেছে এবং খালা শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছে নিচ্ছে।

পুকুরঘাট থেকে ফিরে এসে ও আস্তে করে বলে, যাই খালা।

তুই আবার কবে আসবি?

জানি না। অনেক কাজ।

রোজ রোজ এসে ভাতটা তো খেয়ে যেতে পারিস।

অনেক কাজ। আচ্ছা।

বিড়বিড় করে বলে ও ঘাড় কাত করে। মিঠুর মা জানে, ও আসবে না। তার বুক ভারী হয়ে ওঠে। চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। যেন কিছুক্ষণ আগে মিলিটারির ব্রাশফায়ারে নিহত হয়েছে মধু। গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে যাওয়া লাশটা আনা হয়েছে ওর মায়ের সামনে। মায়েরাই তো এমন। বুক উজাড় করে কাঁদে। সে কান্নায় পাখি গাছের ডালের বসে ডাকতে ভুলে যায়। স্তব্ধ হয়ে থাকে ঘাসফড়িং। নিভে যায় জোছনার আলো। মায়েদের কান্না সইতে পারে না কেউ। ভাবতে ভাবতে ওর চোখ ভিজে ওঠে।

পথে দেখা হয় কুন্তির সঙ্গে। ও একগাদা শাপলা তুলে বাড়ি যাচ্ছে। বুধাকে দেখে চকচক করে ওঠে ওর দৃষ্টি। বলে, কত দিন তুমি আমাদের বাড়িতে আসো না, বুধা ভাই।

সময় পাই না রে। অনেক কাজ।

কী এত কাজ? আমাকে দেখতে তোমার ইচ্ছে হয় না? আমার ভীষণ ইচ্ছে হয় তোমাকে দেখার। কত দিন বাজারে গেলাম, কিন্তু তোমার দেখা পেলাম না।

আমার অনেক কাজ, কুন্তি।

কুন্তি শক্ত কণ্ঠে বলে, আমি জানি তোমার অনেক কাজ। আমিও তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব।

যুদ্ধ করবি?

না তো কী? করবই তো। তুমি শুধু বলবে, আমাকে কী করতে হবে।

চল, বাবা-মায়ের কবরটা দেখে আসি।

চলো। তুমি তো জানো না, যে আমি চাচা-চাচির কবর পরিষ্কার করে রাখি। ঘাস সাফ করি। শুকনো পাতা উঠিয়ে ফেলে দিই। আমি প্রতিটি কবরের মাথায় একটি করে গাছ লাগিয়েছি।

তুই এত কিছু করিস, কুন্তি?

করি তো।

কেন করিস?

তুমি তা হলে খুশি থাকবে এ জন্য।

কুন্তি!

কুন্তির দুচোখে ঝিলিক। বুধা ওর হাত জড়িয়ে ধরে। তারপর ওর হাত ধরে বাবা-মায়ের কবরের কাছে আসে। দেখতে পায় কুন্তি আকন্দ, ভাঁটফুল, ধুতরা–এসব গাছ লাগিয়েছে কবরের মাথায়। কী সন্দুর দেখাচ্ছে কবরগুলো। ও মায়ের কবরের সামনে বসে বলে, মা, তুমি আমাকে দোয়া করো। তোমার ছেলের মাথায় অনেক কাজ। সামনে অনেক কাজ করতে হবে। যদি তোমার সঙ্গে এখানে বসে আর কথা বলতে না পারি–

কুন্তি গলা উঁচু করে বলে, এসব কী কথা বলছ, বুধা ভাই। তুমি কোথায় যাবে?

যাব না, যেতে পারি।

কোথায়?

আকাশে।

আকাশে কেন?

যদি ওই সৈনিকগুলো আমাকে মেরে ফেলে। যদি ওদের গুলিতে আমার বুক ফুটো হয়ে যায়।

ওহ্ আল্লাহ্ রে...। কুন্তি চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে।

কাঁদিস না। থাম। আমি তো জানি তুই ছাড়া আমার আর আপন কেউ নাই। তুই কাঁদলে আমার খুব কষ্ট হয়।

কুন্তি কান্না থামিয়ে অবাক হয়ে বলে, ছাই হয়।

বুধা ওর মাথায় চাঁটি মেরে আবার বাবার কবরের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বলে, তোমার ছেলে যেন তার আনন্দের দিনগুলো ফিরে পায়, বাবা। যেন যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করতে পারে। বাবা, তুমি আমাকে দোয়া করো, যেন সাহস না হারাই । হঠাৎ করে ডুকরে কেঁদে ওঠে বুধা। অবাক হয় কুন্তি। ওকে কখন কাঁদতে দেখেনি। আজ কী হলো?

বুধার কান্না থামলে কুন্তি চোখ গরম করে বলে, তুমি যুদ্ধ করতে ভয় পাচ্ছ? কাঁদছ কেন?

বুধা লজ্জা পেয়ে চুপ করে থাকে। কুন্তি তীব্র ভাষায় বলে, মরণের কথা মনে করলে যুদ্ধ করা যায় না। যুদ্ধ করলে মরতে তো হবেই।

কুন্তি! তুই একটা খুব ভালো মেয়ে।

এই যে শাপলা তুলে এনেছি কেন জানো?

খিদের হাত থেকে বাঁচার জন্য।

খিদে না মরণ। যুদ্ধ ছাড়াও মরণ থাকে।

ছেলেটি অবাক হয়। কুন্তির আজ হলো কী? কুন্তি যেন ধাম করে বড় হয়ে গেল। এক রাতে বড় হওয়ার মতো জাদুর খেলা।

যাই বাড়িতে। মাকে এগুলো দিলে মা রাঁধবে। তবেই না আমাদের খাওয়া হবে। তুমি অনেক দিন আমাদের বাড়িতে যাওনি। আজ চলো।

হ্যাঁ চল। চাচিকে দেখে আসি।

ও কুন্তির হাত ধরে হাঁটতে থাকে।

পরদিন ও দেখতে পায় মাটি কাটার দল ঝুড়ি আর কোদাল নিয়ে ক্যাম্পের দিকে যাচ্ছে। ও এক দৌড়ে ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

ফজু চাচা, আমি আপনাদের সঙ্গে মাটি কাটব।

পারবি? ওই তো শরীর। তোর গায়ে কি বল আছে? যা, ভাগ।

কাজ না করলে খাব কী? আমার খিদে পায় না? আমার কি কেউ আছে?

ও ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। কান্নার এমন ধ্বনি তোলে যে অন্যরা থমকে যায়।

হয়েছে, হয়েছে, কাঁদতে হবে না।

সবাই মিলে ওকে সান্ত্বনা দেয়।

আয় আমাদের সঙ্গে। দলে থাকলে আহাদ মুন্সি তোকে না করতে পারবে না। ও দলে মিশে যায়। গামছায় পেঁচিয়ে মাইনটা কোমরের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছে। গায়ে ঢোলা জামা। বোঝাই যায় না যে ভেতরে কিছু আছে।

বাঙ্কার কাটা শুরু হয়েছে। সবাই ব্যস্ত। কোদালের কোপে উঠে আসছে মাটির ঢেলা। আহাদ মুন্সির ছেলে মতিউর কাজের তদারকি করছে। লোকজনকে ধমকি-ধামকি দিয়ে অস্থির করে তুলেছে।

বুধাকে দলে নেওয়ার জন্য ফজু মিয়াকে বকাবকি করে। কিন্তু একটু পরে কাজে ওর আগ্রহ দেখে খুশি হয়। দৌড়ে দৌড়ে মাটিভরা ঝুড়ি নিয়ে ও পুব দিকে ফেলে আসতে যায়। মাটি ঢেলে খালি ঝুড়ি নিয়ে আবার দাঁড়ায় ফজু মিয়ার সামনে। ওর এমন চটপটে কাজের ভঙ্গি দেখে মতিউর মনে মনে প্রশংসা না করে পারে না। ভাবে, মা-বাবা মরে গিয়ে ছেলেটা বখে গেছে। নইলে একটা কিছু হতে পারত। দুপুর পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি দেখে ও খুশিমনে ভাত খেতে বাড়ি যায়।

বিকেলের মধ্যে বাঙ্কারের কাজ শেষ। সবাই খুশি। সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরতে পারবে। ফজু মিয়া মুখ-হাত ধুয়ে গামছা দিয়ে মুছতে মুছতে ভাবে, যা দিনকাল পড়েছে, সন্ধ্যার পর বাড়ির বাইরে কি থাকা যায়! ঠুস করে একটা গুলি এসে যে বুক ফুটো করে দেবে। এই শুয়োরের বাচ্চারা তো পাখির মতো মানুষ মারে।

সেই মুহূর্তে ছেলেটি ফজু মিয়াকে বলে, চাচা, আমি একবার ভেতরটা দেখে আসি? বাঙ্কার কেমন এ তো আর এই জীবনে দেখা হবে না।

যাবি তো যা। ভেতরে ঢুকে দেখে আয়। কিন্তু সাবধান, সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরব আমরা।

ফজু মিয়ার কাছ থেকে বাড়ি ফেরার কথা কে শুনতে চায়, ওর পায়ে ক্ষিপ্র গতি। মুহূর্তের মধ্যে বাঙ্কারে ঢুকে দুহাতে কাঁচা মাটি সরিয়ে পুঁতে ফেলে মাইনটা। তারপর শিস বাজাতে বাজাতে উঠে আসে। ফজু মিয়া জিজ্ঞেস করে, কি রে, কেমন হয়েছে?

দারুণ! ঢুকলে আর উঠতে মন চায় না। দেখো সেপাইগুলো ওটার ভেতর থেকে আর উঠতে চাইবে না।

ফজু মিয়া হাসতে হাসতে ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, পাগল।

ছেলেটি চোখ নাচিয়ে বলে, রাতের বেলা ওরা বাঙ্কারে শুয়ে হাউইবাজি দেখবে। আহা রে আমি যদি এই বাঙ্কারে থাকতে পারতাম।

ফজু মিয়া ওকে এক পাশে টেনে ফিসফিসিয়ে বলে, আল্লাহ্ মাফ করুক। এখানে থাকার ভাগ্য যেন আমাদের না হয়। এটা হলো ওদের কবর।

ও ফজু মিয়ার পা ধরে সালাম করে ভোঁ দৌড় দেয়। কেন ও সালাম করল, কেন ও দৌড়াচ্ছে ফজু মিয়া বুঝতে পারে না। বোঝে, বেলা পড়ে আসবে। ওকে বাড়ি ফিরতে হবে।

ছেলেটি দৌড়াতে দৌড়াতে নদীর ধারে আসে। সন্ধ্যার আঁধার হয়েছে। ঝোপের ধারে লুকিয়ে থাকা শাহাবুদ্দিনের কাছে পৌঁছে যায় ও। শাহাবুদ্দিন ওকে জড়িয়ে ধরে, তোর জন্য উৎকণ্ঠায় আমি প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছিলাম, মুক্তিযুদ্ধ।

পুঁতে রেখে এসেছি। কোনো ভুল হয়নি। এখন শব্দটা শোনার জন্য বসে থাকব।

শাবাশ ছেলে। নে, মুড়ি খা।

দুজনে মিলে গুড়-মুড়ি খায়। পেঠ ভরলে আঁজলাভরা নদীর পানিতে তিয়াষ মেটায়। শাহাবুদ্দিন বলে, বাঙ্কারকে সহজ করলে কী হয়, বল তো?

বাকার।

আর একটু ছোট করলে?

বকার।

আর একটু ছোট

বকর।

এবার মাঝখানের অক্ষরটাকে সামনে নিয়ে আয়।

কবর।

ও উত্তেজিত হয়ে বলে, বকর, বকর; কবর, কবর। শাহাবুদ্দিন ভাই ওদের কবর।

সেই মুহূর্তে কয়েকজন সেপাই বাঙ্কারে পজিশন নেওয়ার জন্য ঢুকলে পায়ের চাপে বিস্ফোরিত হয় মাইন। প্রচণ্ড শব্দ ছড়িয়ে পড়ে গাঁয়ে, সেই সঙ্গে আর্তচিৎকার। শাহাবুদ্দিন ছেলেটির হাত ধরে লাফিয়ে নৌকায় ওঠে। ক্যাম্পের উল্টোদিকে ছুটে যায় নৌকা। দক্ষ মাঝি এক টানে অনেক দূরে চলে আসে। সন্ধ্যার অন্ধকার চারদিকে। আকাশে ফুটিফুটি তারা।

ছেলেটি নৌকার পাটাতনে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে। দুহাত দুদিকে লম্বা করে মেলে দিয়েছে। কখন যে গায়ের জামাটি খুলে মাথায় বেঁধেছে,শাহাবুদ্দিন তা খেয়াল করেনি। ঠিক কাকতাড়ুয়া সেজে থাকার ভঙ্গিতে শুয়ে আছে। শাহাবুদ্দিন যখন বুঝতে পেরেছে যে ওরা বিপদসীমা পার হয়ে এসেছে,তখন থেকেই ওর ভীষণ গান গাইতে ইচ্ছে করছিল। মনে মনে সুর ভাঁজে। গলা খুলে গাইবার আগেই ছেলেটির দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় ও। চোখের পলক পড়ে না। চারদিকের মাঠ, বাড়ি, ধানখেত, নদী, আকাশ গাছগাছালিজুড়ে ছেলেটি এক আশ্চর্য বীর কাকতাড়ুয়া। রুখে দিচ্ছে শত্রুর গতি। বুকের ভেতর ধরে রেখেছে মুক্তিযুদ্ধ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বুধার কয় ভাইবোন কলেরায় মারা যায়?

ক. ৩ জন খ. ৪ জন গ. ৫ জন ঘ. ৬ জন

২। চঞ্চু কথার অর্থ কী?

ক. পা খ. পাখা গ. ঠোঁট ঘ. কান

৩। হরিকাকুর সঙ্গে বুধার কোথায় দেখা হয়েছিল?

ক. জামতলায় খ. ফসলের মাঠে গ. বাজারে ঘ. রাস্তায়

৪। শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছিল কে?

ক. মতিউর খ. আহাদ মুন্সি গ. হাশেম মিয়া ঘ. হরিবাবু

৫। নিজের বোঝা নিজে বইব। বুধার এ বক্তব্যে ফুটে ওঠে ——

ক. সাহস খ. আত্মবিশ্বাস গ. স্বনির্ভরতা ঘ. দেশপ্রেম

৬। বিদেশি মানুষ এবং নিজেদের মানুষ সবার ওপর বুধার ঘৃণা বাড়তে থাকে কেন?

ক. যুদ্ধ করার জন্য খ. অত্যাচার করার জন্য

গ. বিরোধিতা করার জন্য ঘ. গণহত্যার জন্য

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭ ও ৮নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

'কবর' নাটকে বর্ণিত ইন্সপেক্টর হাফিজ ভাই শহিদদের একটা গণকবরে মাটি চাপা দিতে চাইলে গোরখুঁড়েরা আপত্তি জানায়। তাদের বক্তব্য, 'মুসলমানের লাশ দাফন নাই, কাফন নাই তার ওপর আলাদা একটা কবর পাবে না তা হতে পারে না কভি নেহি।'

৭। উদ্দীপকের গোরখুঁড়েদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রটি হলো—

ক. আহাদ মুন্সি খ. মতিউর গ. বুধা ঘ. কুদ্দুস

৮। এরূপ সাদৃশ্যের কারণ হলো—

ক. দেশপ্রেম খ. প্রতিবাদী মনোভাব গ. সচেতনতা ঘ. প্রতিশোধ স্পৃহা

৯। 'আমরা লড়াই না করলে গ্রামটা একদিন ভূতের বাড়ি হবে'। কেন ভূতের বাড়ি হবে?

i. গণহত্যার কারণে

ii. লোকজন পালিয়ে যাওয়ায়

iii. গ্রামটি জনশূন্য হওয়ায়

কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১০। যুদ্ধে শত্রুরা কখন হেরে যায়?

ক. সবাই ঐক্যবদ্ধ হলে খ. আধুনিক অস্ত্র থাকলে

গ. উন্নত প্রশিক্ষণ থাকলে ঘ. সৈন্যসংখ্যা বেশি হলে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। পাকসেনারা থানায় ঘাটি স্থাপন করলে এলাকার মানুষের মাঝে আতঙ্ক বিরাজ করে। সবাই পালাতে শুরু করলে কলিমদ্দি দফাদার ভিন্ন পরিকল্পনা করেন। তিনি পাকসেনাদের ঘায়েল করার জন্য তাদের সাথে যোগাযোগ শুরু করেন। আর গোপনে সব খবর পৌঁছে দেন, প্রস্তুত থাকতে বলেন। একদিন সুযোগমতো পাক সেনাদের গ্রামে এনে ভাঙা পুলের গোড়ায় দাঁড় করিয়ে কলিমদ্দি দফাদার তা পার হতে গিয়ে পরিকল্পনামাফিক জলে পড়ে যান। সাথে সাথে গর্জে ওঠে ওৎ পেতে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র। আর খতম হয় সব কজন পাকসেনা।

ক. বুধা প্রায়ই কী সাজত?

খ. 'আধা-পোড়া বাজারটার দিকে তাকিয়ে ওর চোখ লাল হতে থাকে'। কেন?

গ. উদ্দীপকের কলিমদ্দি দফাদারের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রটি ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সমগ্র ভাবকে ধারণ করে কি? যুক্তিসহ প্রমাণ করো।

২। ৭ই মার্চের ভাষণ শুনে গর্জে ওঠে কলেজপড়ুয়া আবু সাঈদ। ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে। তাঁর নেতৃত্বে একের পর এক গেরিলা আক্রমণে অতিষ্ঠ পাকসেনারা। অপারেশন জ্যাকপটের সফল অভিযানের পর পাকসেনারা আবু সাঈদের গ্রামে আক্রমণ করে। বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। আর যাকে যেখানে পেয়েছে সেখানেই নির্মমভাবে হত্যা করে। একসময় আবু সাঈদ জানতে পারে স্বজন হারানোর খবর। কিন্তু সে আপসহীন। তার একটাই প্রতিজ্ঞা,এ দেশের মাটি থেকে ওদের তাড়াতেই হবে।

ক. কে বুধাকে 'মানিকরতন' বলে ডাকত?

খ. 'এবার মৃত্যুর উৎপাত শুরু করেছে ভিন্ন রকমের মানুষ'। এ কথা বলার কারণ কী?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কাহিনী 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের যে বিশেষ দিকটির ইঙ্গিত করে তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'উদ্দীপকের আবু সাঈদ-এর মনোভাবই যেন 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের মূল বক্তব্য।' যুক্তিসহ প্রমাণ করো।

৩। জমিদার মফিজ খাঁর নাম শুনলে প্রজারা ভয়ে কাঁপতে থাকে। তার হুকুমের অবাধ্য হলে সে প্রজার আর রক্ষা নেই। ইদানীং তার চেলা হিসেবে কাজ করছে হাসেম ব্যাপারি। সারাক্ষণ তাকে কুপরামর্শ দেয় আর নানা অজুহাতে প্রজাদের হালের বলদ, ঘরের টিন, পুকুরের মাছ ধরে নিয়ে আসে। কেউ প্রতিবাদ করলে তাকে গ্রাম ছাড়া করে। গ্রামের সালিস-বিচার সবই হাসেম ব্যাপারির ইঙ্গিতে চলে। তাই সাধারণ মানুষ কানাঘুষা করে হাসেম ব্যাপারি যেন জমিদারের জমিদার।

ক. শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিল?

খ. যে মানুষের দৃষ্টিতে ভাষা নেই, বুধার মতে সে মানুষ কেন মানুষ নয়?

গ. উদ্দীপকের হাসেম ব্যাপারির সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বর্ণিত আহাদ মুন্সি চরিত্রের সাদৃশ্যের দিকটি ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত দিকটিই 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের একমাত্র দিক নয়– যুক্তিসহ বুঝিয়ে লেখ।

নাটক : ভূমিকা

ক. নাটকের ধারণা ও সংজ্ঞা

নাটক সাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা। নাটক শব্দটির মধ্যেই নাটক কী, তার ইঙ্গিত রয়েছে। নাটক, নাট্য, নট, নটী— এই শব্দগুলোর মূল শব্দ হলো 'নট্'। নট্ মানে হচ্ছে নড়াচড়া করা, অঙ্গচালনা করা। নাটকের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Drama। Drama শব্দটি এসেছে গ্রিক Dracin শব্দ থেকে। যার অর্থ হলো to do বা কোনো কিছু করা। নাটকের মধ্যেও আমরা মূলত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নড়াচড়া, কথাবার্তা ইত্যাদির মাধ্যমে জীবনের বিশেষ কোনো দিক বা ঘটনার উপস্থাপন দেখতে পাই। Online free dictionary-তে নাটকের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে- A prose or verse composition, especially one telling a serious story, that is intended for representation by actors impersonating the characters and performing the dialogue and action.

সাহিত্যের প্রাচীন রূপটিকে কাব্য বলা হতো। কাব্য ছিল দুই প্রকার—শ্রব্য কাব্য ও দৃশ্য কাব্য। তখন সাহিত্য প্রধানত পাঠ করে শোনানো হতো। আর যে কাব্য অভিনয় করে দেখানো হতো, সেগুলো ছিল দৃশ্যকাব্য। এ জন্য সংস্কৃতে নাটককে বলা হয়েছে দৃশ্যকাব্য। কিন্তু নাটককে শুধু দেখার বিষয় বললে পুরোটা বলা হয় না, এতে শোনারও বিষয় থাকে। নাটক মঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমে দেখা এবং সংলাপ শোনার মাধ্যমে দর্শকের সামনে তুলে ধরা হয়। এটি একটি মিশ্র শিল্পমাধ্যম। সংস্কৃতে একে বলা হয়েছে কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ–'কাব্যেষু নাটকং রম্যম্।' নাটক পাঠ করা যেতে পারে; মঞ্চে, টিভি-রেডিও বা অন্য গণমাধ্যমে অভিনীত হতে পারে। বর্তমান সময়ে এটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও জনপ্রিয় মাধ্যম।

খ. নাটকের আঙ্গিক ও গঠনকৌশল

সাহিত্যের অন্যান্য শাখা মূলত পাঠের জন্য হলেও নাটক প্রধানত অভিনয়ের জন্য। তাই এর বিশেষ কিছু গঠনবৈশিষ্ট্য রয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে পার্থক্য থাকলেও নাটকে সাধারণত চারটি উপাদান থাকে। সেগুলো হলো– ১. কাহিনী ২. চরিত্র ৩. সংলাপ ৪. পরিবেশ। নাটকের পাত্রপাত্রী বা চরিত্রগুলোর সংলাপ অথবা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভেতর দিয়ে একটি কাহিনী গড়ে ওঠে। কাহিনীটি হয়তো মানবজীবনের কোনো খণ্ডাংশকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

প্রতিটি নাটকে এক বা একাধিক চরিত্র থাকে। নাটকের কাহিনী বা ঘটনা মূলত নাটকের এই পাত্রপাত্রী বা চরিত্রকে নির্ভর করেই গড়ে ওঠে। চরিত্রগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভিতর দিয়ে নাটকের কাহিনী প্রকাশিত হয়। আবার চরিত্রগুলো মুখর হয় সংলাপের ভেতর দিয়ে। বলা যায়, সংলাপ নাটকের প্রাণ। সংলাপ কাহিনী ও চরিত্রগুলোকে ব্যক্ত করে পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। সংলাপের মাধ্যমেই তৈরি হয় নাট্য পরিস্থিতি। উপন্যাস বা গল্পে লেখক বর্ণনার মাধ্যমে বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি ও ব্যাখ্যা করতে পারেন। নাটকে সে সুযোগ থাকে না। এ ক্ষেত্রে প্রধান অবলম্বন সংলাপ। তাই নাটকের সার্থকতা অনেকাংশে নির্ভর করে সংলাপের ওপর।

নাটকের কাহিনী, চরিত্র বা সংলাপ সংযোজনার জন্য নাট্যকারকে তৈরি করতে হয় উপযুক্ত পরিবেশের। অর্থাৎ কোন পরিবেশ বা পরিস্থিতিতে এ ঘটনাটি ঘটছে বা কোন পরিবেশ পরিস্থিতিতে চরিত্র এ আচরণ করছে বা সংলাপ বলছে, তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হয়। মঞ্চনাটকে মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত, শব্দযোজনা ইত্যাদির মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে এ পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। এ কাজটি মূলত করেন নাট্য নির্দেশক। নাট্যকার তাঁর নাটকেই এর নির্দেশনা রাখেন। তবে উত্তম নাটকের বৈশিষ্ট্য হলো সংলাপের বা অভিনয়ের ভেতর দিয়েই নাটকে পরিবেশ সৃষ্টি করা। নাটকের এই উপাদানগুলোকে একত্র করলেই সফল নাটক সৃষ্টি হয় না; নাটকে বিভিন্ন প্রকার ঐক্য রক্ষা করতে হয়। গ্রিক মনীষী অ্যারিস্টটল নাটকে তিন প্রকার ঐক্যের কথা বলেছেন। ঐক্যগুলো হলো—

১. কালের ঐক্য
২. স্থানের ঐক্য
৩. ঘটনার ঐক্য

কালের ঐক্য বলতে আমরা বুঝি নাটকটি মঞ্চে যতক্ষণ ধরে অভিনীত হবে, ততটুকু সময়ের মধ্যে যা ঘটা সম্ভব নাটকে শুধু তাই ঘটানো। এর বেশি কিছু ঘটানো হলে নাটকটির শিল্পগুণ ক্ষুণ্ন হবে। নাটকটি বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে। এ বিষয়ে একদল নাট্য-সমালোচক মনে করেন,এক সূর্যোদয় থেকে আরেক সূর্যোদয় অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মঞ্চে যতটুকু কাহিনী ঘটানো সম্ভব,তাই নাটকে থাকা উচিত। স্থানের ঐক্য হলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নাটকের চরিত্রগুলো যে পরিমাণ স্থান পরিবর্তন করতে পারে,নাটকে ততটুকুই দেখানো। তার চেয়ে কমবেশি হলে নাট্যগুণ বিঘ্নিত হবে। নাটকে শুরু, বিকাশ ও পরিণতি থাকে। অর্থাৎ নাটকের কাহিনীটি আদি-মধ্য-অন্তসমন্বিত থাকে। ঘটনার ঐক্য হলো এর সূচনা বিকাশ ও পরিণতির মধ্যে সমতা বা সামঞ্জস্য রাখা। মূল ঘটনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এমন ঘটনার সমাবেশ ঘটালে নাটকটির কাহিনীর সামঞ্জস্যতা বিঘ্নিত হবে। তাই নাটকে অপ্রয়োজনীয় ঘটনার সমাবেশ ঘটানো যাবে না। যা কিছু ঘটানো হবে,তা একটি অন্যটির সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকতে হবে। নাটকে একটি কাহিনী যেভাবে অগ্রসর হয়,তাকে পাঁচটি পর্বে বিভক্ত করা হয়। পর্বগুলো হলো —

১. কাহিনীর আরম্ভ বা মুখ (Exposition)
২. কাহিনীর ক্রমব্যাপ্তি বা প্রতিমুখ (Rising Action)
৩. কাহিনীর উৎকর্ষ বা চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব বা গর্ভ (Climax)
৪. গ্রন্থিমোচন বা বিমর্ষ (Failing Action)
৫. যবনিকাপাত বা উপসংহৃতি (Conclusion)

অর্থাৎ একটি নাটক শুরু হওয়ার পর তার কাহিনীর বিকাশ ঘটবে, বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে কাহিনীটি চূড়ান্ত দ্বন্দ্বমুহূর্ত সৃষ্টি হবে। তারপর কোনো সত্য বা তথ্য প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে নাটকটির চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব পরিণতির দিকে যাবে এবং সবশেষে একটি পরিসমাপ্তি ঘটবে।

মনে রাখা প্রয়োজন, এসব বৈশিষ্ট্য নাটকের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে প্রযোজ্য।সব নাটকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না-ও হতে পারে। যেমন, সাম্প্রতিক অনেক নিরীক্ষাধর্মী বা অ্যাবসার্ড নাটকে নাটকের বর্ণিত এ উপাদানগুলো না-ও থাকতে পারে। সাম্যুয়েল বেকেট রচিত 'ওয়েটিং ফর গডো'কে এভাবে পাঁচ পর্বে বিভক্ত করা যায় না। বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার বা সাম্প্রতিক পরীক্ষণ থিয়েটারের ক্ষেত্রে নাটকের এ শর্ত অনেক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।এখানে মূলত প্রথাগত বা আদর্শ নাটকের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

গ. বাংলা নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদে নাটক অভিনীত হওয়ার উল্লেখ রয়েছে। সাম্প্রতিক কিছু গবেষণায়ও দেখা গেছে, চর্যাপদ নৃত্য ও অভিনয়সহ বৌদ্ধ মন্দিরে পরিবেশিত হতো। এ থেকে বলা যায়, বাংলা নাটকের ইতিহাস হাজার বছরের। আমাদের যাত্রাপালার ঐতিহ্যও বেশ পুরনো। তবে নাটক অর্থে আমরা আধুনিক যে মঞ্চ নাটকের (Proscenium theatre) সাথে পরিচিত তা বাংলা অঞ্চলে এসেছে ইউরোপ থেকে। অবশ্য কলকাতায় প্রথম মঞ্চনাটকের যিনি আয়োজন করেন, তিনি ছিলেন একজন রাশিয়ান নাগরিক। তাঁর নাম হেরাসিম স্পেপানভিচ্ লেবেদেফ। ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর তিনি ইংরেজি নাটক 'দ্য ডিসগাইজ' বাংলায় রূপান্তর করে 'কাল্পনিক সংবদল' নামে মঞ্চায়িত করেন। নাটকটি তাঁকে অনুবাদে সাহায্য করেন গোলকনাথ দাস। একইভাবে তিনি 'লাভ ইজ দ্য বেস্ট ডক্টর'ও মঞ্চায়ন করেন। লেবেদেফ এ অঞ্চল থেকে চলে গেলে মঞ্চনাটকে ছেদ পড়ে। তার বেশ কয়েক বছর পর ১৮৫২ সালে অভিনীত হয় তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জ্জুন' ও যোগেশচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্ত্তিবিলাস' (১৮৫২)। তার পরের দুবছরে হরচন্দ্র ঘোষের ভানুমতি চিত্তবিলাস (১৮৫৩) ও রাম নারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব' (১৮৫৪) মঞ্চায়িত হয়।

প্রথম বাংলা আধুনিক নাটক রচনার কৃতিত্ব মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩)। তিনি পাশ্চাত্য নাট্যরীতি অনুসরণ করে ১৮৫৯ সালে 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনা করেন। তারপর একে একে রচনা করেন 'পদ্মাবতী' (১৮৬০), 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১), 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০), 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) প্রভৃতি নাটক ও

প্রহসন। তাঁর সমসাময়িক আরেকজন নাট্যকার হলেন দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)। তাঁর বিখ্যাত নাটকের মধ্যে রয়েছে—'নীল দর্পণ' (১৮৬০), 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩), 'লীলাবতী' (১৮৬৭), 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬) ইত্যাদি।

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) বাংলা সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকার। তাঁর রচিত বিখ্যাত নাটক ও প্রহসনের মধ্যে রয়েছে—'জমীদার দর্পণ' (১৮৭৩), 'বসন্ত কুমারী' (১৮৭৩), 'এর উপায় কি?' (১৮৭৬) ইত্যাদি।

এ সময়ের অন্যান্য নাট্যকারের নাটক ও প্রহসনের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষের (১৮৪৪-১৯১২) এর 'সিরাজউদ্দৌলা' (১৯০৬), দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) 'সাজাহান' (১৯০৯), ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের (১৮৬৪-১৯২৭) 'প্রতাপাদিত্য' (১৯০৩) ইত্যাদি।

সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো বাংলা নাটকেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বিচিত্র ধারার নাটক রচনা করে বাংলা নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর লিখিত বিখ্যাত নাটকসমূহের মধ্যে রয়েছে 'ডাকঘর' (১৯১২), 'রক্তকরবী' (১৯১৬), 'চিত্রাঙ্গদা' (১৯৩৬), 'চিরকুমার সভা' (১৯২৬), 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১) প্রভৃতি।

রবীন্দ্র-পরবর্তী উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে রয়েছে—শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সিরাজউদ্দৌলা' (১৯৩৮), বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' (১৯৪৪), তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' (১৯৫১), উৎপল দত্তের 'কল্লোল' (১৯৬৮), বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' (১৯৬৫) প্রভৃতি।

ঘ. বাংলাদেশের নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত মূলত কলকাতা ছিল বাংলা নাট্যচর্চার প্রাণকেন্দ্র। ভারত বিভাগের পর তৎকালীন পূর্ববঙ্গে ঢাকাকেন্দ্রিক নাট্যচর্চা গড়ে ওঠে। পূর্ববঙ্গের নাট্যচর্চায় স্বাভাবিকভাবেই এ অঞ্চলের সমাজবাস্তবতা-সমাজচিত্র চিত্রিত হতে থাকে, বিশেষত বাঙালি মুসলমান সমাজের চিত্র। এ ধারার নাট্যকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—নুরুল মোমেন (১৯০৬-১৯৮৯) ও আসকার ইবনে শাইখ। নুরুল মোমেন রচিত নাটকের মধ্যে রয়েছে—'নয়া খান্দান', 'নেমেসিস', 'এমন যদি হতো', 'রূপান্তর' প্রভৃতি। আসকার ইবনে শাইখের নাটকের মধ্যে রয়েছে—'তিতুমীর, অগ্নিগিরি', 'রক্তপদ্ম', 'বিদ্রোহী পদ্মা', 'এপার ওপার' প্রভৃতি।

বাংলাদেশের আধুনিক ধারার নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১) ও সৈয়দ ওয়ালীউলাহ (১৯২২-১৯৭১) অগ্রণী নাট্যকার। মুনীর চৌধুরী রচিত নাটকসমূহের মধ্যে রয়েছে—'রক্তাক্ত প্রান্তর' (১৯৬২), 'কবর' (১৯৬৬), 'চিঠি' (১৯৬৬) ইত্যাদি। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর নাটক সম্পর্কে পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের অন্যান্য নাটকের মধ্যে রয়েছে—সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৮-১৯৭৫) রচিত 'সিরাজউদ্দৌলা' (১৯৬৫), 'মহাকবি আলাওল' (১৯৬৬); শওকত ওসমান (১৯১৯-১৯৯৮) রচিত 'আমলার মামলা', 'কাকর মনি'; আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯) রচিত 'ইহুদির মেয়ে', 'মায়াবী প্রহর'; আনিস চৌধুরী (১৯২৯-১৯৯০) রচিত 'মানচিত্র', 'এ্যালবাম'; সাঈদ আহমদ (১৯৩১-২০১০) রচিত 'কালবেলা', 'মাইলপোস্ট', 'তৃষ্ণায়', 'শেষ নবাব'; মমতাজ উদ্দিন আহমদ (১৯৩৫-) রচিত 'স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা', 'হরিণ চিতা চিল', 'রাজা অনুস্বারের পালা', 'এই সেই কণ্ঠস্বর', 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা'; আব্দুল্লাহ আল মামুন (১৯৪৩- ২০০৮) রচিত 'সুবচন নির্বাসনে', 'এখন দুঃসময়', 'চারদিকে যুদ্ধ', 'সেনাপতি', 'অরক্ষিত মতিঝিল'; সেলিম আল দীন রচিত (১৯৪৮-২০০৮) রচিত 'জণ্ডিস ও বিবিধ বেলুন', 'সর্প বিষয়ক গল্প', 'কিত্তনখোলা', 'প্রাচ্য', 'নিমজ্জন'; সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫) রচিত 'নূরলদীনের সারা জীবন', 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়', 'গণনায়ক'; মামুনুর রশীদ (১৯৪৮) রচিত 'ওরা কদম আলি', 'ওরা আছে বলেই', 'ইবলিশ', 'এখানে নোঙর' ইত্যাদি।

ঙ. বহিপীর নাটক ও নাট্যকার পরিচিতি : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ১৯২০(১৯২২) সালের ১৫ আগস্ট চট্টগ্রাম শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ আহমাদউল্লাহ ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা। মা নাসিম আরা খাতুন ছিলেন উচ্চশিক্ষিত ও সংস্কৃতিমান। সৈয়দ

২০১৬

ওয়ালীউল্লাহ্ মাত্র আট বছর বয়েসে মাতৃহারা হন। তিনি ১৯৩৯ সালে কুড়িগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক ও ১৯৪১ সালে ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। তাঁর আনুষ্ঠানিক ডিগ্রি ছিল ডিস্টিংক্শনসহ বিএ। তাঁর পেশাজীবন শুরু হয় 'দৈনিক স্টেটসম্যান' পত্রিকায় সাংবাদিকতা দিয়ে। মাঝখানে কিছুদিন বেতারে চাকরি করেন। তারপর বিদেশে তৎকালীন পাকিস্তান দূতাবাসে কাজ করেন। সর্বশেষ প্যারিসে কাজ করেছেন ইউনেস্কো সদর দপ্তরে। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে তিনি প্যারিসে থেকেই বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করেন।

তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'নয়নচারা' প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে। তারপর একে একে প্রকাশিত হয় উপন্যাস 'লালসালু' (১৯৪৯), নাটক 'বহিপীর' (১৯৬০), সুড়ঙ্গ (১৯৬৪), উপন্যাস 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪), গল্পগ্রন্থ 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' (১৯৬৫), নাটক 'তরঙ্গভঙ্গ' (১৯৬৫), উপন্যাস 'কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮)। তিনি সাহিত্যকর্মের জন্য 'পিইএন পুরস্কার' (১৯৫৫), 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার' (১৯৬১), 'আদমজী পুরস্কার' (১৯৬৫) ও 'একুশে পদক' (মরণোত্তর, ১৯৮৪) লাভ করেন। তিনি অক্টোবর, ১৯৭১ সালে প্যারিসে মৃত্যুবরণ করেন।

বহিপীর

'বহিপীর' নাটক ১৯৬০ সালে ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশের আগে ১৯৫৫ সালে ঢাকায় 'পিইএন ক্লাবে'র উদ্যোগে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে বাংলা নাটকের প্রতিযোগিতায় 'বহিপীর' নাটক পুরস্কার লাভ করে।

'বহিপীর' নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে এক পীরকে কেন্দ্র করে। এই পীর সারা বছর বিভিন্ন জেলায় তাঁর অনুসারীদের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে বেড়ান। এক এক এলাকায় এক এক ধরনের ভাষা। তাই তিনি বিভিন্ন এলাকার ভাষা শিক্ষা না করে বইয়ের ভাষায়ই কথা বলে থাকেন। এ জন্য তাঁর নাম হয়েছে 'বহিপীর'। নাটকের এই কেন্দ্রীয় চরিত্রটির নাম অনুসারেই নাটকের নামকরণ করা হয়েছে বহিপীর। নামটির একটি প্রতীকী তাৎপর্যও রয়েছে। বাঙালি মুসলমান সমাজে পীর সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় কুসংস্কার ও ধর্মীয় বইয়ের পাতা থেকে। মূলত ইসলাম ধর্মের সুফিবাদী ব্যাখ্যার সূত্র ধরেই পীর সমাজের সৃষ্টি। এ হিসেবে তাঁরা ধর্মীয় ব্যাখ্যা মাসায়েল বইয়ের পাতা থেকেই মানুষের সংস্কারকে পুঁজি করে সমাজে ছড়িয়ে পড়েন। নাট্যকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর পিতা ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট। পিতার বদলির চাকরি সূত্রে ওয়ালীউল্লাহ্ সারা বাংলাদেশে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পান। তিনি বাঙালি মুসলমান সমাজে তখন জেঁকে বসা পীর প্রথা কাছে থেকে দেখার সুযোগ পান। ফলে তিনি 'লালসালু' উপন্যাসে যেমন, তেমনি এই নাটকে সে অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

নাটকটি গড়ে উঠেছে বহিপীরের সর্বগ্রাসী স্বার্থ ও নতুন দিনের প্রতীক এক বালিকার বিদ্রোহের কাহিনীকে কেন্দ্র করে। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বহিপীর। তিনি দুই বছরান্তে একবার শিষ্য বা মুরিদদের বাড়িতে ঘুরে বেড়ান। তখন মুরিদরা সর্বস্ব দিয়ে তাঁর সেবা করেন। এবার এক মুরিদ তাঁর মাতৃহারা কন্যা তাহেরাকে এই বৃদ্ধ পীরের সাথে জোর করে বিয়ে দেন। তাহেরা তা মেনে নেয়নি। সে পালায়। সে পালিয়ে হাতেম আলি জমিদারের শহরগামী বজরায় আশ্রয় গ্রহণ করে। বহিপীরও তাঁর সঙ্গী হকিকুল্লাহকে সঙ্গে নিয়ে তার সন্ধানে বের হন। পথিমধ্যে বহিপীরের নৌকা দুর্ঘটনায় পতিত হয় এবং তিনি ঘটনাচক্রে হাতেম আলির বজরাতেই আশ্রয় লাভ করেন। একসময় তিনি জানতে পারেন, এই বজরাতেই তাঁর নববিবাহিত স্ত্রী আছে। তখন তিনি তাকে পাওয়ার জন্য কূটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকেন। অপরদিকে বজরায় জমিদারপুত্র হাশেম আলি তাহেরার করুণ কাহিনী জেনে তার পক্ষ নেয়। এতে বজরায় দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে। বহিপীর জঘন্য কূটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকেন। এমনকি জমিদারের অসহায়ত্বের সুযোগও গ্রহণ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারেন না। তাহেরা ও হাশেম আলি সব বাধার জাল ছিন্ন করে পালিয়ে যায়। বাস্তব পরিস্থিতি বহিপীরও মেনে নেন।

চ. নাটকের চরিত্র পরিচিতি : বহিপীর

বহিপীর নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র ও নাম চরিত্র। তিনি অত্যন্ত ধূর্ত ও বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ। তিনি অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের কুসংস্কার ও ধর্মবিশ্বাসকে পুঁজি করে তাঁর ধর্মব্যবসা পরিচালনা করেন। তিনি সারা বছর তাঁর মুরিদদের বাড়ি

বাড়ি ঘুরে বেড়ান। তাদের কাছ থেকে অর্থসম্পদ সংগ্রহ করেন। এবার তিনি বৃদ্ধ বয়েসে এক মুরিদের কন্যাকে বিয়ে করে বসেন। মুরিদ ও কন্যার সৎমাতা মিলেই সব আয়োজন করে। কিন্তু কন্যা পালিয়ে যায়। তখন তিনি নিজেই হবু স্ত্রীর সন্ধানে বের হন এবং ঘটনাচক্রে তার সন্ধানও পেয়ে যান। তখন তিনি অত্যন্ত চালাকি ও বুদ্ধিমত্তার আশ্রয় গ্রহণ করেন। নাটকে আমরা তাঁকে এ পর্যায়েই দেখতে পাই। আমরা দেখি, তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও বুদ্ধিমান লোক। বাস্তব বুদ্ধিও তাঁর টনটনে। তাঁর স্ত্রীকে উদ্ধারে তিনি পুলিশের আশ্রয় গ্রহণ করার অভিনয় করেন। কিন্তু জানে, এতে অনেক ঝামেলা। তাই ওই পথে এগোন না। তিনি প্রথমে ধর্মীয় বিয়ের দোহাই দেন। কিন্তু তাহেরা তার পাল্টা যুক্তি দিলে তা থেকে তিনি সরে আসেন। তিনি তখন মানবিকতার বাহানা করেন। বলেন এ মেয়ে কখনো স্নেহ-মমতা পায়নি। তাঁর কাছ থেকে স্নেহ-মমতা পেলে বুঝতে পারবেন। এতেও কাজ না হওয়ায় তিনি জমিদারের অসহায়ত্বের সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি টাকা দিয়ে জমিদারের জমিদারি রক্ষা করার প্রস্তাব করেন। শর্ত হিসেবে তাহেরাকে ফেরত চান। কিন্তু তাঁর সব চক্রান্ত একসময় ব্যর্থ হয়। তাহেরা ও হাশেম আলি পালিয়ে যায়। তখন আমরা দেখি তিনি বাস্তবতা মেনে নেন। তিনি তাদের তাড়া করতে নিষেধ করেন। এতে তাঁর একই সাথে বুদ্ধিমত্তা ও বাস্তবজ্ঞানেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

তাহেরা

তাহেরা এই নাটকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। একবিচারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। কেননা, তাকে কেন্দ্র করেই নাটকটির ঘটনাপ্রবাহ আবর্তিত হয়েছে। সে মাতৃহারা। তার কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাবা ও সৎমাতা তাকে বৃদ্ধ পীরের সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু সে এ অন্যায় বিয়ে মেনে নেয়নি। পালিয়েছে। দুঃসাহসের সাথে শহরগামী বজরায় চড়ে বসেছে। কিন্তু একসময় পীরের কাছে ধরা পড়ে। বজরার একমাত্র হাশেম আলি ছাড়া অন্য সবাই প্রায় তার বিরুদ্ধে গেলেও সে বৃদ্ধের সাথে তার না যাওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেনি। এ হিসেবে তাহেরা একটি অত্যন্ত অনমনীয় চরিত্র। কিন্তু যখন সে জমিদারের অসহায়ত্বের কথা জেনেছে, তখনই সে রাজি হয়েছে। মানবিকতার পরিচয় দিয়েছে। অর্থাৎ সে একই সাথে অনমনীয় ও মানবিক চরিত্র। সবশেষে সে নতুন জীবনের সন্ধানে হাশেম আলির হাত ধরে অজানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে। তাহেরাকে বিশ শতকের প্রারম্ভে নারী অধিকার ও জাগরণের প্রতীক চরিত্র বলা যায়।

হাশেম আলি

হাশেম আলি জমিদারপুত্র। সে এই নাটকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। সে কেন্দ্রীয় চরিত্র বহিপীরের বিপরীত চরিত্র। সে অত্যন্ত শান্তভাবে বহিপীরের কূটচালকে মোকাবিলা করেছে এবং পরিশেষে জয়লাভ করেছে। বহিপীর নেতিবাচক চরিত্র। ব্যক্তিগত স্বার্থের হিসেবে সে জীবন ও জগৎকে গণনা করে। অন্যদিকে হাশেম আলি ইতিবাচক চরিত্র। মানবীয় মূল্যবোধ ও ন্যায়বোধের গুরুত্ব তার কাছে সর্বাধিক। এ অর্থে হাশেম আলিকেই নায়ক এবং বহিপীরকে খলনায়ক হিসেবে বিবেচনা করা যায়। হাশেম আলি জমিদারপুত্র হলেও বৈষয়িক বিবেচনা তার কাছে কম। জমিদারি নিয়ে ভাবে না। সে বিএ পাস। এখন একটি প্রেস বসাতে চায়। পিতার জমিদারি চলে গেলে এবং এজন্য প্রেস বসাতে না পারলেও সে চিন্তিত নয়। সে ভাবে, যখন পড়ালেখা করেছে তখন একটা কিছু হয়ে যাবে। সে অত্যন্ত যুক্তিবাদী, আধুনিক ও মানবিক অনুভূতি সম্পন্ন মানুষ। বজরায় সেই প্রথম অচেনা মেয়েটির সমস্যার প্রকৃতি উপলব্ধি করে। সে তার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে পড়ে। মেয়েটি আত্মহনন করতে গেলে সে তাকে রক্ষা করে। পুরো বজরার মানুষ যখন তার বিরুদ্ধে তখনো সে মেয়েটির পক্ষ ত্যাগ করেনি। নাটকে তাকে অস্থিরচিত্ত বলে বর্ণনা করা হলেও সে তার অবস্থানে ছিল স্থির। এ ক্ষেত্রে মাতার সাবধানবাণী, বহিপীরের ভীতি প্রদর্শন, পিতার করুণ মুখ কিছুই তাকে পিছু টলাতে পারেনি। সে তাহেরাকে বাঁচাতে চেয়েছে। এমনকি বিয়ে করে হলেও। জমিদারপুত্র হিসেবে তাহেরা তার কাছে অচেনা একটি পরিচয়হীন মেয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সব বৈষয়িক বিষয়বস্তু ত্যাগ করে মেয়েটিকে নিয়ে অনিশ্চিত-অজানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে। তার এ পদক্ষেপকে অবশেষে বহিপীর নিজেই সঠিক বলে অনুমোদন করেছেন। হাশেম আলি ধর্মীয় কুসংস্কার ও সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক চরিত্র।

হাতেম আলি

হাতেম আলি একজন ক্ষয়িষ্ণু জমিদার। খাজনা বাকি পড়ার কারণে তাঁর জমিদারি সূর্যাস্ত আইনে নিলামে উঠেছে। জমিদারি রক্ষার জন্য তিনি শহরের বন্ধুদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছেন। তাঁর জমিদারি নিলামের সংবাদটি তিনি পরিবারের সবার কাছে গোপন রেখেছেন। চিকিৎসার অজুহাতে তিনি শহরে গিয়েছেন, কিন্তু তিনি অর্থ সংগ্রহে ব্যর্থ হন। অবশেষে তিনি বহিপীরের কাছে কথাটি বলেন। বহিপীর তাঁকে কঠিন শর্ত দেয়। অর্থ ধারের বিনিময়ে তাঁর স্ত্রীকে তাঁর হাতে তুলে দিতে হবে। মেয়েটিও এতে রাজি হয়। কিন্তু বেঁকে বসেন জমিদার নিজেই। কেননা তাঁর নিজেকে নিজের কাছে কসাই মনে হতে থাকে। তাঁর মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয়। তিনি টাকা নিতে অস্বীকৃতি জানান। এতে হাতেম আলির উচ্চ নৈতিকতাবোধের পরিচয় ফুটে উঠেছে। হাতেম আলি স্থিতধী, আত্মনিমগ্ন উচ্চ মানবিক চেতনাসম্পন্ন একটি উজ্জ্বল চরিত্র।

অপ্রধান চরিত্রসমূহ

হকিকুল্লাহ ও জমিদার গিন্নি এই নাটকের দুটি অপ্রধান চরিত্র। জমিদার গিন্নি অত্যন্ত সাদামাটা একটি চরিত্র। তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অত্যন্ত ধর্মভীরু। বজরায় একটি অচেনা মেয়ে আশ্রয় চাইলে তিনি তাকে আশ্রয় প্রদান করেছেন। মেয়েটির দুঃখের কাহিনী জেনে তিনি ব্যথিত হয়েছেন। আবার যখন জেনেছেন, মেয়েটি একজন পীরের পালিয়ে আসা স্ত্রী তখন তিনি তাকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন, এ বিয়ে অন্যায়, কিন্তু পীরের অভিশাপের ভয়ে ভীত থেকেছেন। আবার ছেলে ও পীর মুখোমুখি অবস্থান নিলে তিনি পীরের পক্ষ নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট থাকতে চেয়েছেন। কিন্তু ছেলেকেও শক্তভাবে দমন করতে পারেননি। তাঁর মধ্যে বাঙালি চিরায়ত মায়ের প্রতিমূর্তি ফুটে উঠেছে। হকিকুল্লাহ পীরের ধামাধরা একটি ব্যক্তিত্বহীন চরিত্র। সে বহিপীরের সহকারী। নাটকে সে মূলত পীরের আজ্ঞা পালন করেই চলেছে।

নাটকটিতে প্রতিফলিত সমাজচিত্র থেকে বোঝা যায়, নাটকটির সময়কাল উনিশ শতকের শেষভাগ বা বিশ শতকের সূচনালগ্ন। নাটকে দেখা যায়, জমিদার হাতেম আলি সূর্যাস্ত আইনে তাঁর জমিদারি হারাতে বসেছেন। সূর্যাস্ত আইন প্রণীত হয় ১৭৯৩ সালে এবং এ আইনে জমিদারি হারাতে থাকে এ সময় পর্যন্ত। সে সময়ে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জেঁকে বসা পীর প্রথা, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের চিত্র ফুটে উঠেছে এই নাটকে। এই নাটকে আমরা দেখতে পাই পীর সাহেবকে ধনীগরিব সবাই অসম্ভব ভয় ও মান্য করেন। গ্রামের সাধারণ মানুষ তাদের পীরকে পেলে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তার সেবা করার জন্য পাগল হয়ে যায়। ধনসম্পদ থেকে শুরু করে নিজ কন্যাকে পর্যন্ত তারা দান করে। নাটকটি বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রচলিত পীর প্রথার একটি বিশ্বস্ত দলিল। কিন্তু নাটকটি শেষ পর্যন্ত আমাদের আলোর পথ দেখায়। এ অবস্থা বদলানোর সংকেত প্রদান করে। নাটকটির দুটি প্রধান চরিত্র হাশেম আলি ও তাহেরা এ ব্যবস্থা ভেঙে বেরিয়ে আসে। কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাসের স্থানে মানবিকতার জয় হয়। অপরাপর চরিত্রগুলোর মধ্যেও যৌক্তিক মানবিক বোধ জাগ্রত। নাটকটি এভাবে মানবিক জাগরণের দৃশ্যকাব্য হয়ে ওঠেছে।

বহিপীর

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

[হেমন্তের বেলা নয়টা। পানির শব্দ, দূরে জাহাজের সিটি-ধ্বনি, তীরে ফেরিওয়ালার হাঁকাহাঁকি, ভাটিয়ালি গানের অতি ক্ষীণ রেশ ইত্যাদির সমবেত কোলাহলের মধ্যে পর্দা উঠলে দেখা যাবে মঞ্চের অধিকাংশ স্থানজুড়ে দু-কামরাওয়ালা একটি রঙদার বজরা। কোণে সামান্য উঁচু পাড়, বজরা থেকে সে পাড়ে যাতায়াতের জন্য একটা সিঁড়ি।

দর্শকের দিকে বজরাটি খোলা। পেছনে জানালাগুলোর অধিকাংশ তোলা, যার ভেতর দিয়ে অপর পারের আভাসও কিছুটা পানি দেখা যাবে। বজরার সামনে পাটাতনে বসে একটি চাকর মসলা পেষে; একটু দূরে একজন মাঝি আপন মনে দড়ি পাকায়। তারই কাছাকাছি বসে হকিকুল্লাহ হুঁকা টানে। ছাদে শুকায় একটি রঙিন আলখাল্লা ও পায়জামা।

বড় কামরায় হাতেম আলি চাদরে আধা-শরীর ঢেকে বহিপীরের সঙ্গে কথোপকথন করেন। তাঁর বয়স পঞ্চাশের মতো, মুখে চিন্তার ছাপ। কথা বলতে বলতে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। বহিপীরের বয়স কিছু বেশি কিন্তু মজবুত শরীর। মুখে আধা-পাকা দাড়ি, মাথায় চুল ছোট করে ছাঁটা।

পাশের ঘরে হাতেম আলির ছেলে হাশেম আলি মোড়ায় বসে বসে তার মা খোদেজা ও তাহেরার তরকারি কোটা দেখে। হাশেম আলি যুবক মানুষ; অস্থির মতি ও একটুতে রেগে ওঠার অভ্যাস। কখনো সে পায়চারি করে, কখনো বসে, কখনো বা লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে জানালার ধারে বিছানা পাতা বেঞ্চির ওপর।

তাহেরার বয়স অল্প; মুখে সামান্য উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। সেটা অবশ্য সব সময়ে পরিলক্ষিত হয় না।

সারা সকাল খোদেজা আর তাহেরা রান্নাবান্নার কাজ করবে। বাইরে যে চাকরটিকে মসলা পিষতে দেখা যাবে, সে থেকে থেকে আসবে যাবে এটা-সেটা নিয়ে।

পর্দা ওঠার পর হাতেম ও বহিপীরের আলাপ করতে দেখা যাবে বটে, কিন্তু তার আওয়াজ শোনা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত পাশের ঘরে হাশেম আলি ও খোদেজার কথাবার্তা শেষ না হয়। দুই কামরার মধ্যে দরজাটি বন্ধ]

হাশেম - কী ঝড়ই হলো শেষ রাতে! এমন ঝড় কখনো দেখিনি। সময়মতো খালের ভেতর ঢুকতে না পারলে কে জানে কী হতো। (তাহেরার দিকে তাকিয়ে) আপনি ভয় পেয়েছিলেন কী?

তাহেরা - (মাথা নাড়ে কেবল)

খোদেজা - যে মেয়ে ঘর ছেড়ে পালাতে পারে, সে অত সহজে ভয় পায় না। কিন্তু আমি এ কথা বুঝি না যে তুমি কী করে পালাতে পারলে। কথাটা যেন বিশ্বাস হতে চায় না। কে কখন এমন কথা শুনেছে? (একটু থেমে) পালাবার সময় সত্যিই এ কথা খেয়াল হয়নি যে কোথায় যাব কোথায় থাকব কী করে এমন কাজ করি?

তাহেরা - (আবার মাথা নাড়ে)

খোদেজা - (কাজ করতে করতে) কাল ডেমরার ঘাটে আমরা যদি বজরা না থামাতাম আর বিপদে পড়েছ দেখে তোমাকে যদি তুলে না নিতাম, তবে কোথায় থাকতে এখন, যেতেই বা কোথায়? (উত্তর না পেয়ে) হঠাৎ দেখি তীরে ভিড়। একটা ছেলে কাঁদছে, পাশে অল্প বয়স্কা একটি মেয়ে চুপচাপ বসে আছে। চাকরটা এসে বলল, একটি মুসলমান মেয়ে বিপদে পড়েছে।

সঙ্গে একটি ছেলে, সেও ডাকচিৎকার পেড়ে কাঁদছে। তাদের নাকি কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই? জানেও না কোথায় যাচ্ছে। শুনে ভিড় জমে গেছে, বদলোকেরা তোমাকে চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছে, এক-আধটু ঠাট্টা-মস্করা করতেও শুরু করেছে। (থেমে) কথাটা একবার ভেবে দ্যাখ; আমি তোমাকে ডেকে না পাঠালে কী হতো তোমার?

তাহেরা - (সামান্য হেসে) অত ভাবলে কি কেউ পালাতে পারে?

হাশেম - ছেলেটি কে ছিল?

তাহেরা - চাচাতো ভাই।

খোদেজা - তার কথা সে বলেছে আমাকে। অল্প বয়সের ছেলে, না বুঝে না শুনে ওর কথায় পালানোর সাথী হয়েছিল। কিন্তু ডেমরায় পৌঁছে ছেলেটার হঠাৎ হুঁশ হলো; এ কী সে করছে। তখন বলে, পুলিশ এলো, এসে ধরল তাদের। তা ছাড়া ক্ষিধাও পেয়েছে অথচ পয়সা নাই কারও কাছে। ভয়ে আর ক্ষিধায় কাঁদতে লাগল ছেলেটা। (তাহেরাকে) অথচ তুমি মেয়ে হয়েও তোমার চোখে না ছিল ভয়, না ছিল কান্না, শাবাশ মেয়ে তুমি। এমন মেয়েও কারও পেটে জন্মায়, জানতাম না।

তাহেরা - (হেসে) আপনার তো বুড়োর কাছে বিয়ে হয়নি, আপনি কী করে বুঝলেন কেন বা কী করে পালিয়েছি?

খোদেজা - (বিস্ময়ে) কথা শোনো! বুড়োর কাছে বিয়ে হলেই এমন করে পালায় নাকি কেউ? বিয়ে হলো তকদিরের কথা। কারও ভালো দুলা জোটে, কারও জোটে না, কেউ স্বাস্থ্য, সম্পদ সবাই পায়, কেউ পায় না। তাই বলে পালাতে হয় নাকি? ওটা কত বড় গুনাহ্ তা বোঝো না?

তাহেরা - (মুচকি হেসে, উত্তর না দিয়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে) নদীতে খালি কচুরিপানা। নদীতে বেগুনি রঙের শাপলা থাকে না, পদ্ম-পলাশ থাকে না। খালি কচুরিপানা, কেবল কচুরিপানা ভেসে যায়।

খোদেজা - না, মেয়েটির চিন্তাভাবনা নাই। সুখেই আছে।

হাশেম - বাড়িতে কে আছে আপনার?

তাহেরা - (একনজর হাশেমের দিকে তাকিয়ে) বাপজান আর সৎমা। যে বুড়ো পীরের সঙ্গে বাপজান আমাকে বিয়ে দিলেন, আমরা তাঁর মুরিদ। অবশ্য আমি না, আমার বাপজান ও সৎমাই তাঁর মুরিদ। বছরে-দুইবছরে পীরসাহেব একবার এলেই তাঁরা তাঁর খাতির-খেদমত করার জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন। (থেমে হঠাৎ রেগে) আমি কি বকরি-ঈদের গরু ছাগল নাকি?

খোদেজা - কী ঢঙের কথাই যে তুমি বলো! পীরের সঙ্গে বিয়ে হওয়াটা কোনো খারাপ কথা নয়। (হঠাৎ মনে পড়ায়) ভালো কথা, পীরসাহেব রাতেও খাবেন নাকি, হাশেম?

হাশেম - না। দুপুরে খাওয়ার পরেই চলে যাবেন। আব্বা অনেক বললেন কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। তাঁর নাকি জরুরি কাজ আছে। পীরসাহেবের লেবাসও দুপুরের মধ্যে শুকিয়ে যাবে। কাল রাতে মাঝিরা তাঁকে আমাদের বজরায় তুলে না নিলে তিনি হয়তো ডুবেই মারা যেতেন।

খোদেজা - তাঁর নৌকার সঙ্গে বজরার কী করে ধাক্কা লাগল বুঝলাম না।

হাশেম - ঝড়ের সময় বজরা আর নৌকা একই সঙ্গে খালের ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করছিল। অন্ধকারের মধ্যে আর হাওয়ার ধাক্কায় মাঝিরা বোধ হয় ঠিক সামাল দিতে পারেনি। ধাক্কা খেয়ে নৌকাটা এক মিনিটে আধা-ডোবা হয়ে গেল। ভাগ্য ভালো, বজরার কিছু হয়নি। মনে হয়, ধাক্কা খাওয়ার আগেই পীরসাহেবের নৌকাটা বেসামাল হয়ে পড়েছিল। পীরসাহেব আর তাঁর সঙ্গী দুজনেই কিছুটা নাকানি-চুবানি খেয়েছেন।

খোদেজা - কিন্তু আমাদের বজরায় কী হচ্ছে বুঝতে পারছি না। কোত্থেকে এলো অচেনা-অজানা এই মেয়েটি। তারপর পানিতে ডুবে মরতে মরতে বজরায় উঠে জান বাঁচালেন এক পীরসাহেব।

হাশেম - (তাহেরার দিকে তাকিয়ে) এই পীরসাহেব আপনার পীরসাহেব নন তো?

তাহেরা - না। তাঁকে ভালো না দেখলেও তাঁর গলা অনেক শুনেছি। নিশ্চয়ই গলা চিনতাম। তা ছাড়া তিনি হঠাৎ নৌকা করে এদিকে যাবেনই বা কোথায়?

হাশেম - (রসিকতা করে) হয়তো আপনার খোঁজে বেরিয়েছেন।

তাহেরা - (কথাটা ভেবে ভয় পায়; কিছু বলে না।)

খোদেজা - তাহলে তো ভালোই হয়। এই বজরাতেই পীরসাহেব আর তাঁর বিবির মিলন হয়, মাঝখানে থেকে আমরা কিছু সওয়াব পাই।

তাহেরা - (হঠাৎ তরকারি কোটা বন্ধ করে অধীরভাবে সোজা হয়ে বসে) না না, অমন কথা বলবেন না।

খোদেজা - (বিরক্ত হয়ে) না, এমন মেয়ে কখনো দেখিনি, বাবা। বয়স হলেও পীর হলো পীর। তা ছাড়া জোয়ান পীর তো দেখা যায় না।

[পাশের ঘর থেকে হাতেম আলি ছেলেকে ডাকেন, হাশেম, হাশেম। হাশেম সেই কামরায় যায়। যাওয়ার সময় দরজা খুলে তাহেরা উঁকি মেরে দেখে, তারপর হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। তাহেরা আর খোদেজা মাঝে মাঝে আলাপ করবে বটে, কিন্তু এবার তাদের কথার আওয়াজ দর্শকদের নিকট পৌঁছাবে না।]

হাতেম আলি - পাশের ঘরে বসে আছ কেন? পীরসাহেবের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করো। (হাশেম দূরে একটা মোড়ায় বসে।) ছেলেটি কলেজে পড়া শেষ করে এখন ছাপাখানা দিতে চায়। বলে, ছাপাখানার ব্যবসা বড় ভালো। আমি কিন্তু অত বুঝি না। শরীরটা আমার ভালো নাই। আমি বলি, কদিন বাঁচি না-বাঁচি ঠিক নাই, যত দিন জিন্দা আছি আমার সঙ্গে থাকো। আমার তো আর ছেলেপুলে নাই। কিন্তু কী বলব, সবই খোদার মর্জি, তাঁর ইচ্ছা বোঝা মুশকিল, কার ভাগ্যে কী আছে তাই বা কে জানে। ধরুন না কেন, আপনার সঙ্গে এইভাবে দেখা হবে এ—কথা কী কখনো কল্পনা করতে পেরেছি? কে ভেবেছিল হঠাৎ এমন ঝড় উঠবে, খালের ভেতরে ঢোকার সময় আমার বজরার সঙ্গে আপনার নৌকার এমন ধাক্কা লাগবে, যার দরুন আপনার নৌকা আধা-ডোবা হবে? কিন্তু সে যা-ই হোক, আপনার যে শারীরিক কোনো ক্ষতি হয় নাই, তার জন্য খোদার কাছে হাজার শোকর। তা ছাড়া, দুর্ঘটনার সময় আপনাকে আমার বজরায় স্থান দিতে পেরেছি তাতে আমি নিজেকে বড় ধন্য মনে করছি।

বহিপীর - সবই খোদার হুকুম। (থেমে) আপনার সম্পূর্ণ পরিচয়-তো এখনো পাইলাম না।

হাতেম আলি - আমার নাম হাতেম আলি। রেশমপুরে আমার যৎকিঞ্চিৎ জমিদারি আছে। এইটে আমার একমাত্র ছেলে, নাম হাশেম আলি। একটু অস্থির প্রকৃতির, খোদা চাহে-তো মতিগতি ভালোই। সে যা-হোক। কদিন ধরে আমার শরীরটা মোটেই সুবিধার মনে হচ্ছে না, ভাবলাম, শহরে এসে দাওয়াই করাই। একাই আসতে চেয়েছিলাম; কিন্তু বিবি সাহেবা আর ছেলেটি একা আসতে দিল না! যাক্, এসেছে ভালোই হয়েছে। (থেমে) আচ্ছা পীরসাহেব, বেয়াদপি মনে না করেন তো একটি সওয়াল করি। আপনার নাম বহিপীর কী করে হলো?

বহিপীর - আপনি লক্ষ করিয়া থাকিবেন যে আমি কথাবার্তা বিলকুল বহির ভাষাতেই করিয়া থাকি। ইহার একটি হেতু আছে। দেশের নানা স্থানে আমার মুরিদান। একেক স্থানে একেক ঢঙের জবান চালু। এক স্থানের জবান অন্য স্থানে বোধগম্য হয় না, হইলেও হাস্যকর ঠেকে। আমি আর কী করি। আমাকে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সব দিকেই যাইতে হয়, আমি আর কত ভাষা বলিতে পারি। সে সমস্যার সমাধান করিবার জন্যই আমি বহির ভাষা রপ্ত করিয়া সে ভাষাতে আলাপ-আলোচনা কথাবার্তা করিয়া থাকি, বহির ভাষাই আমার একমাত্র জবান। তা ছাড়া কথ্য ভাষা আমার কানে কটু ঠেকে। মনে হয়, তাহাতে পবিত্রতা নাই, গাম্ভীর্য নাই। আমার কর্তব্য মানুষের কাছে খোদার বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া। উক্ত কার্যের জন্য পুস্তকের ভাষার মতো পবিত্র ও গম্ভীর আর কোনো ভাষা নাই। কথ্য ভাষা হইল মাঠ ঘাটের ভাষা, খোদার বাণী বহন করার উপযুক্ততা তাহার নাই।

হাতেম আলি - আপনি ঠিক কথাই বলেছেন, বইয়ের ভাষার মতো আর ভাষা নাই। একটা কথা পীরসাহেব, দুর্ঘটনায় আপনার যাত্রার ব্যাঘাত ঘটেনি তো? আপনি কি এই শহরেই আসছিলেন?

বহিপীর - (ইতস্তত করে) ব্যাঘাত? হ্যাঁ ব্যাঘাত কিছু ঘটিয়াছে বৈকি। তবে অতি নিকটেই কোথাও আমাকে যাইতে হইবে। একটু দেরি হইল বটে, কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। খাওয়া-দাওয়ার পরই হকিকুল্লাহ্ মজবুত দেখিয়া একটি নৌকা ঠিকা করিয়া লইবে, তারপর আবার রওয়ানা হইয়া পড়িব। জানে বাঁচিয়া আছি ইহাই যথেষ্ট। খোদার ভেদ বোঝা সত্যই মুশকিল। কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটাইলেন, মরিতে মরিতে কেন আবার বাঁচিয়া রহিলাম আর আপনার বজরাতেই কেন বা আশ্রয় পাইলাম, তাহা তিনিই জানেন। কেবল ইহাই বলিতে পারি যে, নিশ্চয় ইহাতে কোনো গূঢ়তত্ত্ব আছে,যাহা এখন বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমি বড় শ্রান্ত বোধ করিতেছি। আশা করি শরীর খারাপ হইবে না। কত আর ছোটাছুটি করিতে পারি। বয়স-তো হইয়াছে। একেকবার ভাবি, যাহা চাহিয়াছিলাম তাহা পাই নাই, কেবল মুরিদান করিয়াই জীবন কাটাইয়াছি। মুরিদ হওয়ার জন্য লোকেরা দলেবলে আসিয়াছে, কেহ কাঁদিয়াছে, কেহ ধনসম্পদ উজাড় করিয়া আমার পায় ঢালিয়া দিয়াছে। তাহারাই আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, আমাকে কোনো অবসর দেয় নাই, এবাদত করিবার ফুরসত দেয় নাই। সারা জীবন কেবল মুরিদের মঙ্গল কামনাই করিয়াছি, কখনো ফল পাইয়াছি কখনো পাই নাই, সবই খোদার ইচ্ছা। কিন্তু এখনো সময় আছে। মধ্যে মধ্যে ভাবি, সমস্ত ছাড়িয়া ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়ি যেই দিকে দুই চোখ যায়, সেই দিকে পা দুইটা আমাকে লইয়া যায়।

হাতেম আলি - হয়তো খোদা তা চান না।

বহিপীর - হয়তো।

খোদেজা - (পাশের ঘর থেকে) হাশেম! (এক ডাকেই হাশেম উঠে সেই কামরায় যায়।)

[এখন সে,কামরারই কথাবার্তার আওয়াজ দর্শকের কাছে পৌঁছাবে; বহিপীর ও হাতেম আলি হাত-মুখ নেড়ে কথা বলতে থাকবে বটে, কিন্তু সে আওয়াজ শোনা যাবে না।]

খোদেজা - মেয়েটি দ্যাখ কেমন করছে। তুই যখন পাশের কামরায় যাচ্ছিলি, তখন খোলা দরজা দিয়ে পীরসাহেবকে সে দেখেছে। ওর সন্দেহ হচ্ছে, তিনিই সেই পীর।

তাহেরা - (তরকারি কোটা ছেড়ে সোজা হয়ে বসে) তিনি কে?

হাশেম - তাঁর নাম বহিপীর, তিনি এদিককার লোক নন; উত্তরে সুনামগঞ্জে তাঁর বাড়ি।

তাহেরা - (সভয়ে আপন মনে) ইনিই তিনি, বহিপীর। যিনি বইয়ের ভাষায় কথা বলেন। বাপজান আর সৎমা যাঁর মুরিদ আর যাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। (থেমে) তিনি আমার খোঁজে বেরিয়েছেন।

[হঠাৎ লাফিয়ে উঠে জানালার কাছে গিয়ে গলা বাড়িয়ে পানি দেখে।]

হাশেম - আম্মা! উনি কি করছেন ওখানে?

তাহেরা - (এদের দিকে ঘুরে বিস্ফারিত চোখে) খবরদার! আমার কাছে কেউ আসবেন না, এলেই আমি পানিতে ঝাঁপ দেব । আমি সাঁতার জানি না, পানিতে ডুবে মরব।

খোদেজা - (চিৎকার করে) অরে, এই মেয়েটা পাগলি দেখছি! কী বলে সে।

হাশেম - আম্মা চিৎকার করবেন না, পাশের ঘরে পীরসাহেব শুনবেন। তিনি এখনো জানেন না যে তাঁর বিবি এখানেই আছেন।

তাহেরা - (ব্যঙ্গ করে) তাঁর বিবি। বহিপীরের বিবি। তিনি আমাকে কখনো দেখেননি, তার ঘরও করিনি খেদমতও করিনি।

হাশেম	-	দেখুন, আপনি ওখান থেকে সরে আসুন। আপনার কোনো ভয় নেই। আপনার কথা পীরসাহেব জানেন না, জানবেনও না আর খেয়েদেয়ে দুপুরেই তিনি চলে যাবেন।
তাহেরা	-	(হঠাৎ নেবে বসে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করে। মনে হবে অনেকক্ষণ কাঁদবে কিন্তু শীঘ্রই চোখ মুছে শান্ত গলায়) আমাকে যখন আশ্রয় দিয়েছেন, তখন আর এইটুকুও আমার জন্য করুন, তাঁকে আমার কথা বলবেন না।
হাশেম	-	না না। কেউ বলবে না।
খোদেজা	-	হাশেম, সে কেমন কথা। পীরসাহেবকে না বলে কী করে পারি? তার সঙ্গে না গেলে কোথায় যাবে মেয়েটা, কে দেখবে তাকে?
হাশেম	-	আম্মা। এখন তো একটু চুপ করুন।
তাহেরা	-	আপনারা আমার জন্য যথেষ্ট করেছেন। ডেমরা ঘাট থেকে তুলে নিয়ে বজরায় আশ্রয় দিয়েছেন। দয়া করে আরেকটু করুন। কারণ, আমি পীরসাহেবের সঙ্গে কিছুতেই যাব না। পানিতে ঝাঁপ দিয়ে মরব, তবু যাব না। আমার কথা অবিশ্বাস করবেন না।
হাশেম	-	(হঠাৎ জোর দিয়ে) দেখুন, আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার কোনো ভয় নেই। আমি কথা দিচ্ছি, পীরসাহেবের সঙ্গে আপনাকে ফিরে যেতে হবে না।
খোদেজা	-	তুই আবার এর মধ্যে অত লম্বা-চওড়া কথা বলিস কেন? তোর বাপ ফিরে আসুন, তিনি বুঝে-শুনে যা-ই করতে বলবেন তা-ই করা হবে। (পাশের ঘর থেকে পীরসাহেব ডাকেন, হাশেম মিঞা) ঐ যে পীরসাহেব তোকে ডাকছেন। গিয়ে দ্যাখ, তাঁর কী চাই। তা ছাড়া এ ঘরে তোর অত ঘুরঘুর করার কী প্রয়োজন? মেয়েটারও যেন একটু লজ্জা-শরম নাই। থাকলে কী এমন করে পালাতে পারে?
বহিপীর	-	হাশেম বাবা–। ও হাশেম মিঞা!
হাশেম	-	(গলা উঁচিয়ে) এই যে আসছি পীরসাহেব। (তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে) আম্মা, ছেলে হয়েও আপনার সঙ্গে কোনো দিন এত কথা বলি নাই বা মুখের ওপর জবাব দিই নাই। কিন্তু এখন সব যেন কেমন ওলট-পালট হয়ে গেছে। কাজেই আমাকে বলতেই হচ্ছে। আম্মা, শোনেন আমার কথা। পথ থেকে একটা বিপন্ন মেয়েকে তুলে নিয়েছেন। ভুল করে হোক আর যা-ই করে হোক, তিনি ঘর ছেড়ে পালিয়েছেন–সেটা একটি মেয়ের পক্ষে সোজা কথা নয়। আপনি বুঝতেই পারেন তাঁর মনের অবস্থা আপনার আমার মতো নয়। হলে কি তিনি পানিতে ঝাঁপ দিয়ে নিজের হাতে নিজের জান দেওয়ার কথা বলতেন? তা ছাড়া, ডেমরার ঘাটে তাঁকে বিপন্ন অবস্থায় দেখে আপনার মনে যখন মমতা জেগেছিল, তাঁকে না চিনে, না জেনেও যখন নিজের বজরায় তুলে নিয়েছেন, তখন তাঁর প্রতি আপনার কি একটু দায়িত্বও নেই? আম্মা, তাঁকে এখন আর কোনো কথা বলবেন না; একটু সবুর করে থাকুন। উনি যদি সত্যি হঠাৎ পানিতে ঝাঁপ দেন, তখন আপনি কি একা তাঁকে ঠেকাতে পারবেন?
খোদেজা	-	(বিস্ময়ে) তুই কী চাস? পীরসাহেবের বিবিকে নিয়ে তোর এত মাথা ব্যথা কেন?
হাশেম	-	আমি বরঞ্চ পাশের ঘরে যাই, পীরসাহেব বারবার ডাকছেন।
		[দ্রুতপায়ে পাশের ঘরে চলে যায়। খোদেজা কয়েক মুহূর্ত নত মুখে বসে থাকা তাহেরার দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর আবার রান্নায় হাত দেন।]
বহিপীর	-	এমন জোয়ান-মর্দ ছেলে, মায়ের আঁচল ধরিয়া বসিয়া থাকিবার অভ্যাস কেন?
হাশেম	-	রান্নাবান্না হচ্ছে, একটু সাহায্য করছিলাম। কেন ডাকছিলেন?

বহিপীর - বিশেষ কিছু না। ভাবিতেছিলাম, আপনার হইল কী। হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইলেন না তো?

হাশেম - কী করে নিরুদ্দেশ হই? পানিতে ঝাঁপ দিয়ে না পড়লে ওই কামরা থেকে তো আর পালানো যায় না।

বহিপীর - উত্তম কথা, উত্তম কথা!

হাশেম - উত্তম কথা, কেন বলছেন পীরসাহেব?

বহিপীর - না না উহা একটি কথার কথা, কিন্তু যে জন্য ডাকিয়াছিলাম। আরে, তাই তো কী জন্য ডাকিলাম তাহা আর মনে পড়িতেছে না। বোধ হয়, একাকী বসিয়া বসিয়া ভালো লাগিতেছিল না। সর্বদা ওয়াজ-নছিহত করিবার অভ্যাস, কাহারও সঙ্গে কথা না কহিয়া বেশিক্ষণ থাকিতে পারি না। তা ছাড়া একাকী চুপচাপ বসিয়া থাকিলে মনে অশান্তি হয়। সে কথা যাক। আপনার আব্বা ফিরিতে এত দেরি করিতেছেন কেন?

হাশেম - (পাড়ের দিকে তাকিয়ে) এই যে তিনি ফিরেছেন।

[হাতেম আলি অতি ধীর পায়ে প্রবেশ করেন, তাঁর মুখ চিন্তাভাবাচ্ছন্ন। তাঁকে আরও দুর্বল দেখায়, লাঠি হাতেই তিনি তফাতে বেঞ্চির ওপর বসে নীরব হয়ে থাকেন।]

হাশেম - আব্বা! আপনার কী হয়েছে? আপনাকে অমন দেখাচ্ছে কেন?

বহিপীর - (হাতেম আলি কোনো উত্তর না দেয়ায়) খোদা না করুন, কোনো দুঃসংবাদ নাইতো জমিদার সাহেব?

হাতেম আলি - (মুখ তুলে চেয়ে) দুঃসংবাদ? না, দুঃসংবাদ আর কী? তবে অসুস্থ শরীরে চলাফেরা করায়ও একটু হয়রান বোধ করছি। হাশেম, আমাকে এক গ্লাস পানি এনে দাও।

[হাশেম ক্ষিপ্রগতিতে পাশের ঘরে যায়, গিয়ে নিজেই কলসি থেকে পানি ঢালে।]

খোদেজা - পানি কার জন্য, হাশেম?

হাশেম - আব্বার জন্য, তাকে অত্যন্ত হয়রান দেখাচ্ছে।

খোদেজা - কেন হয়রান দেখাচ্ছে? কী হয়েছে তাঁর? ডাক্তার কী বলল হাশেম?

হাশেম - (দ্রুতপায়ে বেরিয়ে যেতে যেতে) এখনো জানি না।

হাতেম আলি - (পানি পান করে) হাশেম, আমি পীরসাহেবের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই, তুমি পাশের ঘরে যাও।

হাশেম - (অধীর হয়ে) কী এমন কথা আপনি পীরসাহেবকে বলবেন আমি শুনতে পারি না?

হাতেম আলি - হাশেম।

বহিপীর - যাও বাবা, বাপের মুখের ওপর কথা কহিও না।

[হাশেম গ্লাস তুলে নিয়ে পাশের ঘরে চলে যায়, গিয়ে সটান বেঞ্চিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে। খোদেজা উঠে এসে পাশে দাঁড়িয়ে আলাপ করে কিন্তু তার আওয়াজ শোনা যাবে না।]

হাতেম আলি - (মেঝের দিকে চেয়ে) পীরসাহেব, আমার মাথার ওপর হঠাৎ যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে; চারদিকে আমি অন্ধকার দেখছি। আমার পায়ের তলা থেকেও যেন মাটি সরে যাচ্ছে।

বহিপীর - কী ব্যাপার, খুলিয়া বলেন। আমাকে বলিতে দ্বিধা করিবেন না।

হামেত আলি - আপনার বহুত মেহেরবানি পীরসাহেব, যে আপনি দুঃখের কথা শুনতে চাবেন, তাতে একটু ভরসা পাচ্ছি। আপনাকে বলে মনের চিন্তা হয়তো লাঘব হবে, হয়তো আপনি আমাকে একটু পথও বাতলে দিতে পারবেন। সত্যি আমি কোনো পথ দেখছি না। এখন কী করে যে নিজের পরিবারের কাছে আর দেশের দশজনের কাছে মুখ দেখাব, জানি না।

বহিপীর - খোদা যা করেন তা ভালোর জন্যই করেন, আজই তাহার আরেকটি প্রমাণ হাতেনাতে পাইয়াছি। আপনি দিল খুলিয়া সমস্ত কথা আমাকে বলেন।

হাতেম আলি - প্রথমে একটি ব্যাপারে আমি আপনার কাছে মাফ চাই। আমি আপনার কাছে একটা ঝুট কথা বলেছি। বলেছি, আমার শরীর অসুস্থ, দাওয়াই করার জন্য শহরে এসেছি। সে কথা সত্যি নয়, তবে চিন্তায় কদিনে এত কাহিল হয়ে পড়েছি যে রোগশয্যায় আছি বলেই মনে হয়। শরীরে এক ফোঁটা রক্ত নেই যেন। কিন্তু পীরসাহেব, অসুখের ভান না করে আমার উপায় ছিল না। ব্যাপারটা গোপন রাখব ভেবেই অসুখের ভান করেছিলাম। মুখে দুশ্চিন্তার যে ছায়া পড়েছিল সে দুশ্চিন্তার যুক্তিসঙ্গত কোনো উত্তর ছিল না। ওরা যখন সঙ্গে আসতে চাইল অসুখের কথা শুনে, তখন জোর করে না-ও করতে পারলাম না। একবার ঝুট কথা বললে উপায় নেই, তখন একটার পর একটা বলতে হয়; একবার শুরু হলে তার শেষ নাই। কিন্তু এখন সবকিছু শেষ হয়েছে, আসল কথাটা আর মিথ্যা কথা দিয়ে ঠ্যাকা দেওয়া যায় না।

বহিপীর - খোদা ইচ্ছা করিলে পড়ন্ত ঘরও ঠ্যাকা দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখা যায়। ভালোমন্দ খোদারই হাতে। বলেন জমিদার সাহেব, বলেন কী ব্যাপার।

হাতেম আলি - আপনাকে বলেছি রেশমপুরে আমার কিঞ্চিৎ জমিদারি আছে। একসময়ে এই জমিদারের নাম ডাক ছিল, তার আয়ও ছিল প্রচুর। কিন্তু সেই সুদিন আমার জমানার আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমার হাতে যে জমিদারিটা এলো তা কেবল ঢাকের ঢোল বাজালে আওয়াজ হয়, কিন্তু ভেতরে অন্তঃসারশূন্য, দেখতে বড় কিন্তু ভেতরে ফাঁকা। তবু তা থেকে যৎসামান্য যা আয় হয়ে উঠত তাই দিয়ে কোনো প্রকারে মানমর্যাদা রেখে ভরণপোষণ চলত। কিন্তু সে জমিদারিও সান্ধ্য আইনে পড়ে নিলামে উঠতে বসেছে। কালই নিলামে উঠবে।

বহিপীর - সবই খোদার ইচ্ছা, খোদাই দুনিয়ার মালিক।

হাতেম আলি - আমার আশা ছিল, আমি কোনো প্রকারে যথেষ্ট টাকা জোগাড় করতে পারব, শেষ পর্যন্ত জমিদারি নিলামে চড়াটা বন্ধ করতে পারব। সে আশা নিয়েই আমি শহরে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম, আমার বাল্যবন্ধু আনোয়ারউদ্দিন আমাকে সাহায্য করবেন, সেখানে আমাকে নিরাশ হতে হলো। আনোয়ারউদ্দিন বলে দিলেন তিনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন না। পীরসাহেব, জমিদারি আর বাঁচানো যাবে না, এবার সে জমিদারি যাবেই! আমি দেউলে হব, আমার পরিবার দেউলে হবে; আমার সবকিছু উচ্ছন্নে যাবে। (থেমে) আর কথাটা লুকিয়ে রাখি কী করে? এবার আমি কীই বা করি! (থেমে) আমার ছেলেটি কত আশা করেছিল যে তাকে ছাপাখানা কেনার টাকা দেব, এবার তার সাধের স্বপ্নও ভাঙবে।

বহিপীর - আহা জমিদার সাহেব, এত বেচইন হইয়া পড়িবেন না, খোদার উপর তোয়াক্কা রাখুন। দুনিয়াটা মস্ত এক পরীক্ষা ক্ষেত্র। খোদা কাকে কীভাবে পরীক্ষা করেন তা বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের নাই।

হাতেম আলি - (হঠাৎ রেগে) পরীক্ষা? কিসের পরীক্ষা। আমি কী অন্যায় করেছি, আমার বিবি সাহেব ও আমার ছেলেই বা কি অন্যায় করেছে?

বহিপীর - জমিদার সাহেব। দুঃখে সংবিৎ হারাইবেন না।

হাতেম আলি - (নাক ঝেড়ে ক্রন্দন সম্বরণ করে) না না মানসম্মান সম্পত্তি সবই যখন গেল, তখন কী আর মাথা হারালে চলে? ভাববার বুঝবার শক্তিও যদি যায়, তবে থাকবে কী, কিন্তু আমার মনে শক্তি কোথায়? পীরসাহেব, এবার আমি কী করব?

বহিপীর - ধৈর্য ধরুন জমিদার সাহেব। এই মুহূর্তে ইহা ব্যতীত আর কিছু বলিতে পারি না। কিন্তু আপনাকেও আমার একটি জরুরি কথা বলার আছে। দুঃখের বিষয় এই যে, আপনার এই

নিদারুণ বিপদের সময়ই আমাকে এই কথা বলিতে হইতেছে। যদি পারেন, একটু মনোযোগ দিয়া আমার কথা শ্রবণ করুন।

হাতেম আলি - (নিস্তেজ গলায়) বলুন!

বহিপীর - শীঘ্রই শেষ করিব, দেরি হইবে না বলিতে। গোড়া হইতে বলি। আপনি যেমন আমার নিকট হইতে একটি কথা লুকাইয়াছেন, তেমনি আমি একটি কথা আপনার নিকট হইতে লুকাইয়াছি। আমার এই যাত্রার আসল উদ্দেশ্য আপনাকে বলি নাই, আমার উদ্দেশ্য এখন হাসিল হইয়াছে, তাই বলিতে তো বাধা নাই। উপরন্তু আপনি ব্যাপারটার সহিত জড়িত আছেন বলিয়া আমাকে বলিতেই হইবে। না হইলে আপনার এই দুঃখের সময় কথাটা পাড়িতাম না।

হাতেম আলি - আমি জড়িত? কীভাবে পীরসাহেব?

বহিপীর - অতি আশ্চর্য; কিন্তু উহা সত্য। ব্যাপারটা হইতেছে এই; গত জুম্মা রাতে তাহেরা বিবি নামে একটি বালিকার সঙ্গে আমার শাদি মোবারক সম্পন্ন হয়। তিনি আমার এক পেয়ারা মুরিদের কন্যা। অত্যন্ত হাউস করিয়া তিনি আমার সহিত তাঁহার কন্যার শাদি দিয়াছিলেন। তিনিই কথা পাড়িয়াছিলেন। আমি ভাবিয়া দেখিলাম, নেক পরহেজগার মানুষ: বিষয়-আশয় তেমন না থাকিলেও বংশ খান্দানি। আমারও বয়স হইয়াছে, দেখভাল করিবার জন্য আর খেদমতের জন্য একটি আপন লোকের প্রয়োজন আছে। আমার প্রথম স্ত্রীর এন্তেকাল হয় চৌদ্দ বৎসর আগে। আমি পুনর্বার শাদি না করিয়া খোদার এবাদত আর মানুষের খেদমতই করিয়াছি। আমার সন্তান-সন্ততিও নাই, দেখাশুনা করিবার জন্য এক হকিকুল্লাহ্ আছে। কিন্তু সে আর কত করিতে পারে। দেখিলাম, বিবাহ করাটাই সমীচীন হইবে। অতএব আমি নিমরাজি হইতেই বাকি কার্যের ভার আমার পেয়ারা মুরিদ নিজের হাতেই গ্রহণ করিলেন। কিন্তু বিবাহের রাতেই এক অত্যাশ্চর্য ইসানে গায়ের-মামুলি কাণ্ড ঘটিল। আমার বিবি যাঁহাকে তখনো আমি দেখি নাই–একটি নাবালেগ চাচাতো ভাইকে সঙ্গে করিয়া বাড়ি ছাড়িয়া পালাইয়া গেলেন। বাড়িতে হুলুস্থুল পড়িল। আমার মুরিদের মুখ ভয়ে শুকাইয়া গেল। আমি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম যে তাঁহার ইহাতে কোনো কসুর নাই, তাঁহার কন্যার ব্যবহারের জন্য তাহাকে দোষারোপ করা যায় না, অবশ্য তাহার যে দোষ নাই সে কথা বলাও সঠিক হইবে না। পুত্র-কন্যার শিক্ষাদীক্ষার ভার পিতা-মাতার উপরেই। সে শিক্ষাদীক্ষার গাফিলতি হইলে দোষটা পিতামাতার ঘাড়েই পড়ে। সে কথা যাক। আমার মুরিদ অধীর হইয়া পুলিশে পর্যন্ত খবর দিতে চাহিলেন। কিন্তু তাহাতে আমি মত দিলাম না। পুলিশ নিয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিলে জানাজানি হইবার সম্ভাবনা; উহা কেই বা চায়। আমি বলিলাম, অমিই খুঁজিতে বাহির হইব। সেই রাতেই হকিকুল্লাহ্‌কে সঙ্গে করিয়া আমি বাহির হইয়া পড়িলাম। ঠিক পথই ধরিয়াছিলাম এবং এতক্ষণ তাঁহাকে ধরিতেও পারিতাম যদি কদমতলা না গিয়া ডেমরা যাইতাম, কিন্তু কী বলিব, ভুলটা খোদাই শোধরাইয়া দিলেন আপনার বজরার সঙ্গে আমার নৌকার সংঘর্ষ ঘটাইয়া। কারণ, ডেমরার ঘাট হইতে আপনি আমার বিবিকে তুলিয়া লইয়াছেন। এখন তিনি পাশের কামরাতেই অবস্থান করিতেছেন।

হাতেম আলি - পাশের ঘরে? আহ্! আমার মাথাটার কী হয়েছে। দুশ্চিন্তায় পড়ে তাঁর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, কাল ডেমরার ঘাটে আমার বিবি একটি মেয়েকে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি আপনার বিবি?

বহিপীর - সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনি জানেন তিনি কে, কোথায় বাড়ি কী তাঁর নাম?

হাতেম আলি - জি না। মনের চিন্তায় ছিলাম, ও কথা জিজ্ঞাসা করার খেয়াল হয়নি।

বহিপীর - হুঁ। না, আমার মনে কোনোই সন্দেহ নাই যে যাঁহাকে আপনারা কাল ডেমরার ঘাট হইতে তুলিয়া লইয়াছেন তিনিই আমার পলাতকা বিবি। কিন্তু তবু সাবধানের মার নাই। কথাটা একটু গওর করিয়া দেখুন। শুনিতেছেন তো জমিদার সাহেব।

হাতেম আলি - (একটু ঘুরে বসে বহিপীরের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে) মনে শান্তি নাই পীরসাহেব, কিন্তু শুনছি আপনার কথা।

বহিপীর - যাহা বলিতেছিলাম। আমি তাঁহাকে কখনো দেখি নাই।আপনারাও তাঁহাকে চেনেন না।তিনি ঘর ছাড়িয়া আমার ভয়ে পালাইয়া আসিয়াছেন। কাজেই আমি বলা মাত্র তিনি যে সুড়সুড় করিয়া আমার সঙ্গে চলিয়া আসিবেন, সে কথা ভাবা অনুচিত হইবে। সুযোগ পাইলে তিনি আমাকে ফাঁকি দিবার ফন্দি-ফিকির নিশ্চয়ই বাহির করিবেন।অতএব,তিনি যদি আত্মপরিচয় ঢাকিয়া রাখেন তাহা হইলে প্রমাণাদি ব্যতীত তাহাকে আমার বিবি বলিয়া দাবি করা মুশকিল হইতে পারে। আপনার এখানে তিনি একাই আছেন, তাহার চাচাতো ভাইটি নাই। সে থাকিলে কোনো চিন্তা ছিল না। সেই নিশানাটি হারাইয়াই তো মুশকিল হইয়াছে। তবে একটা ভরসা। বলিলে নিজেরই ক্ষতি হইবে জানিয়াও স্ত্রীলোক কখনো পেটে কথা চাপিয়া রাখিতে পারে না। বিশেষ করিয়া আপনাদের সঙ্গে আমার যখন কোনোই যোগাযোগ ছিল না, তখন হয়তো বা তিনি আপনার স্ত্রীর নিকট নিজের আত্মপরিচয় ঢাকিয়া রাখেন নাই। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে সন্দেহ না জানাইয়া সে কথাটা প্রথমে যাচাই করিয়া লইতে চাই। আপনার ছেলে সে ঘরেই বড় বেশি ঘুরঘুর করিতেছে। সেও জানিয়া থাকিতে পারে। প্রথমে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে কেমন হয়? জমিদার সাহেব! অত বেহুঁশ হইয়া পড়িলে কি হইবে?

হাতেম আলি - (জেগে উঠে) না না। বেহুঁশ হয়ে পড়েছি কোথায়। বলুন পীরসাহেব।

বহিপীর - (সুর বদলে) ধৈর্যহারা হইবেন না জমিদার সাহেব। দুনিয়াটা সত্যি কঠিন পরীক্ষাক্ষেত্র। কিন্তু দেখিতেছেন না এই বজরাতে ভাগ্যের কেমন অত্যাশ্চর্য লীলাখেলা চলিতেছে? ইহা সবই খোদার ইঙ্গিতে হইতেছে। আপনি বুকে সাহস ধরুন; আপনার সমস্যারও সমাধান হইবে! জমিদার সাহেব, আপনার ছেলেকে একটু ডাকিবেন?

হাতেম আলি - জি। হাশেম! (পাশের কামরা থেকে উঠে ক্ষিপ্রগতিতে হাশেম এ কামরায় এসে হাজির হয়) হাশেম। পীরসাহেব তোমাকে ডেকেছেন।

বহিপীর - বাবা হাশেম, তোমাকে একটি প্রশ্ন করিতে চাই। কাল ডেমরার ঘাটে একটি বিবাহিতা তরুণীকে বিপন্না অবস্থায় দেখিয়া তোমাদের বজরায় ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছ। তাঁহার পরিচয় কি তিনি তোমাদের বলিয়াছেন।

হাশেম - (ইতস্তত করে) বোধ হয় বলেছেন। আমি ঠিক জানি না।

বহিপীর - তাঁহার পরিচয় জানা আমার বিশেষ প্রয়োজন। আপনি ভিতরে যান, আর কথায় কথায় তাঁহার পরিচয় জানিয়া লউন। আমি যে জানিতে চাই তাহা অবশ্য বলিবেন না।

হাশেম - জি আচ্ছা। (হাশেম ভেতরে যায়, গিয়ে দরজা ধরে চুপচাপ ভাবিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে।)

খোদেজা - হাশেম, কী হয়েছে তোর আব্বার?

হাশেম - কিছু বুঝতে পারছি না। আব্বা পীরসাহেবের সঙ্গে কী আলাপ করলেন তাও জানি না। কিন্তু এখন তিনি ওঁর (ইঙ্গিতে তাহেরাকে দেখিয়ে) পরিচয় জানতে চান। তার অর্থ হলো এই যে, তাঁর কথা তিনি সঠিকভাবে পুরোপুরি জানেন না। (ভেবে) ব্যাপারটা বুঝেছি। (হঠাৎ মাথার কাছে উবু হয়ে বসে) আম্মা! পীরসাহেব তাঁকে কখনো দেখেননি। তিনিই যে তাঁর বিবি সে কথাও ঠিক জানেন না। একটি মেয়েকে ডেমরার ঘাট হতে তুলে আমরা আশ্রয় দিয়েছি,সে কথাই শুধু

জানতে পেরেছেন। যদি আমরা তাঁকে তাঁর সঠিক পরিচয় না বলি, তবে তিনি জানতেই পারবেন না যে তিনিই তাঁর বিবি। আপনি যদি অনুমতি দেন তবে পীরসাহেবকে তাঁর পরিচয় বলি না।

খোদেজা - হাশেম। এ কী করে সম্ভব! তোর কি মাথা খারাপ হলো নাকি? এই মেয়েটা তোর মাথা খেলো নাকি?

হাশেম - (উঠে দাঁড়িয়ে) মাথা খাবে কেন? কিন্তু আমরা কি তাঁকে এইটুকু সাহায্য করতে পারি না? আপনি এই কথা বুঝতে পারছেন না যে আমরা যদি তাঁকে সাহায্য না করি তবে তাঁর জীবনটা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। আম্মা, আমি পীরসাহেবকে গিয়ে বলছি যে তিনি আমাদের তাঁর আত্মপরিচয় দেননি। আমরা জানি না কোথায় তাঁর বাড়ি, কী তাঁর নাম।

খোদেজা - হাশেম। তোর হয়েছে কী? কী চাস তুই?

হাশেম - (দ্রুত মাথা নেড়ে) না, আমি কিছুই চাই না। শুধু তাঁকে বাঁচাতে সাহায্য করতে চাই।

খোদেজা - যার সঙ্গে পীরসাহেবের ন্যায্যমতো বিয়ে হয়েছে তাকে তুই বাঁচাবার কে?

হাশেম - আম্মা! আমি তাঁকে বাঁচাবই। তাঁকে বিয়ে করে হলেও বাঁচাব। আম্মা শুনছেন।

খোদেজা - তুই কি সত্যিই এই চাস যে পীরসাহেবের বদ্‌দোয়া নিয়ে সংসারে আগুন ধরিয়ে দিই? পীরের দোয়ার জন্য মানুষ কি-না করে আর তুই একটি অচেনা-অজানা মেয়ের জন্য সজ্ঞানে মাথায় বদ্‌দোয়া ডেকে নিবি? না, আমিই বলব। তুই যদি না বলিস তবে আমিই নিজেই বলব। (ক্ষিপ্রভঙ্গিতে উঠে পড়ে দরজার কাছে গিয়ে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে) পীরসাহেব, আপনার বিবি আমার সঙ্গেই আছেন।

হাশেম - আম্মা।

বহিপীর - শোকর আল্‌হামদোলিল্লাহ!

[তাহেরা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে। হাশেম বিস্ময়াভিভূত। শুধু জমিদার সাহেব নিস্তেজভাবে মেঝের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন।]

[পর্দা নামবে]

দ্বিতীয় অঙ্ক

(স্টেজ পূর্ববৎ, কিন্তু বজরাটা ছাড়া সবকিছু রাতের অন্ধকারে ঢাকা। আকাশে ছিটেফোঁটা তারা।]

দুই কামরাতেই লণ্ঠন জ্বালানো আছে। বাইরের ঘরে মোড়ার ওপর স্বপ্নাবিষ্টের মতো বসে হাতেম আলি। চোখের পাতা পড়ে না; দৃষ্টি ভাবনায় নিমজ্জিত। বেঞ্চিতে চাদর গায়ে বসে বহিপীর তসবি টেপেন আর ঘন ঘন ভেতরে দরজার দিকে তাকান। তাঁর পরনে রঙিন আলখাল্লা আর পায়জামা।

পাশের কামরায় হাশেম অস্থিরভাবে পায়চারি করে। পর্দা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মোনাজাত করে নামাজ শেষ করে খোদেজা পান বানাতে বসেন। ওধারে বেঞ্চিতে পিঠ খাড়া করে বসে তাহেরা; তার নড়ন-চড়ন নেই আর দৃষ্টি মেঝের ওপর নিবদ্ধ।

বাইরে আবছায়ার মধ্যে বসে হকিকুল্লাহ্ হুঁকা খায়। একটু দূরে চাকরটি আর মাঝি দুজন আধ-শোয়া অবস্থায় গাল-গল্প করে।]

হাতেম আলি - সারা বিকাল, সারা সন্ধ্যা কাটল আশায় আশায় যে বাল্যবন্ধু আনোয়ার আসবে। ভেবেছিলাম, সাহায্য করতে পারবে না বলে থাকলেও চিরদিনের বন্ধুত্বের খাতিরে শেষে কোনো প্রকারে টাকা জোগাড় করে বাল্যবন্ধুকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে আসবে। কিন্তু সে এলো না। (থেমে) আর একটা রাত। এত দিনের পুরনো জমিদারির শেষরাত। আমার ছেলে আর তার মা এখনো জানে

২০১৬

না যে এইটেই তাদের জমিদারির শেষ রাত। তাদের এখনো বলতে পারিনি! এখনো কি মনে আশা আছে? আর কিসের আশা?

বহিপীর - (কিছুটা বিরক্তভাবে) খোদার কথা খেয়াল করুন জমিদার সাহেব। বিলাপ করিয়া কী হইবে?

হামেত আলি - তাই। বিলাপ করে কী আর হবে। তাতে রাতের গায়ে তো আর আঁচড় পড়বে না, অন্যান্য রাতের মতো এই রাতও একসময়ে শেষ হয়ে যাবে। যাক যাক, শেষ হয়ে যাক।

বহিপীর - (দরজার দিকে তাকিয়ে) হাশেম বাবা ফিরে না কেন?

হাতেম আলি - (হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠে সামান্য রুক্ষতার সঙ্গে) পীরসাহেব, আপনি আছেন আপনার খেয়ালে। এক বিবি গেলে আপনি আরেক বিবি আনতে পারেন। কিন্তু আমার জমিদারি একবার গেলে আর ফিরে আসবে না? একবার সর্বস্বান্ত হলে আমি আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব না। এখন আমি সর্বস্বান্ত হতে বসেছি। বুকে আর এতটুকু সাহস নাই। বিবি আর ছেলেকে যে কথাটা খুলে বলব, সে সাহস পর্যন্ত পাচ্ছি না।

বহিপীর - দেখুন, খোদাই রিজিকদেনেওয়ালা। যার তকদিরে যত রিজিক ধার্য করা আছে, সে তাহার বেশি ভোগ করিতে পারে না। সে রিজিক ধীরে ধীরে ভোগ করিলে ভোগের সময় দীর্ঘ হইবে; দ্রুত খাইয়া ফেলিলে শীঘ্র তাহা শেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু তবু খোদা কিছু না কিছু ব্যবস্থা করেন। যাহাকে একেবারে নিঃস্ব মনে হয় তাহারও কিছু না কিছু থাকে। আর কিছু না থাকিলেও রুহানিয়াৎ তো থাকিতে পারে। না, কেউ কখনো একেবারে নিঃস্ব হয় না।

হাতেম আলি - (যেন বোঝে) ঠিক কথা বলেছেন পীরসাহেব, কেউ একেবারে নিঃস্ব হয় না। কেবল সব সময়ে বুঝে ওঠে না। বুঝি, তবু যেন বুঝি না।

বহিপীর - সে কথা না বুঝিলেও আমার সমস্যা সম্বন্ধে খোঁটা দিয়া একটি কথা বলিতে ছাড়িলেন না। কিন্তু আমার কথাটাও একবার বুঝিবার চেষ্টা করুন। আপনার মনে হইতে পারে যে, যে বিবিকে আমি চোখে পর্যন্ত দেখি নাই বা যাঁহার সঙ্গে এক মুহূর্তের জন্য মিলিত হই নাই, তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য কেন এত প্রচেষ্টা। মানুষ সময়ের দীর্ঘতা দিয়াই সব বিচার করে, কিন্তু তাহা ভুল। একবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেই সে দায়িত্ব পালন করা একান্ত ফরজ হইয়া পড়ে। সময়ের স্বল্পতার কথা বলিয়া সে দায়িত্বের ভার হইতে নিজেকে মুক্ত করা যায় না। এক মুহূর্তের স্ত্রীর প্রতি যেমন দায়িত্ব, দশ বছরের স্ত্রীর প্রতিও সেই সমান দায়িত্ব। কাজেই, আমার বিবির সহিত চোখাচোখি পর্যন্ত না ঘটিয়া থাকিলেও শাদি মোবারক যখন একবার সম্পন্ন হইয়াছে, তখন তাঁহার প্রতি আমার দায়িত্ব সম্পূর্ণ মাত্রায় রহিয়াছে। দশ বছরের বিবিও হঠাৎ ভুলবশত কোনো তরিকাবিহীন কাজ করিয়া বসিলে আমার যেমন কর্তব্য হইত তাঁহাকে বিপথ হইতে সপথে আনা, এই বিবির প্রতিও আমার সেই সমান কর্তব্য। (থেমে গলা নিচু করে) জমিদার সাহেব আবার বেঁহুশ হইয়া পড়িয়াছেন : তাঁহার কর্ণকুহরে কিছু প্রবেশ করিতেছে না। বৃথা বকা। কিন্তু হাশেম বাবা ফিরে না কেন। ঐ কামরায় একবার ঢুকিলে সে যেন জোঁকের মতো লাগিয়া থাকে, অত আকর্ষণ কিসের? (গলা উঁচিয়ে) হাশেম মিঞা।

হাশেম - পীরসাহেব আবার ডাকছেন। সারা দুপুর আর সারা বিকাল ধরে এ-কামরা সে-কামরা করছি, আর ভালো লাগে না। কত মতলবই না তিনি ঠাওরালেন, কত কথাই না বললেন। আর আমি যেন বার্তাবাহক। যেন যুদ্ধক্ষেত্রে শর্ত-পাল্টা শর্তের কথা নিয়ে দুই জোরদার শত্রু-শিবিরের মধ্যে যাতায়াত করছি। কিন্তু বার্তাবাহককে যে দলহীন হতে হয়। কোনো দলের প্রতি একটু টান থাকলে আর ঘটনাপ্রবাহ তার অনুকূল না হলে তার পক্ষে নির্বিকার থাকা মুশকিল। আমার সত্যিই আর ভালো লাগছে না।

তাহেরা	-	(সামান্য অভিমানের সুরে) আপনার এ গোলমাল ভালো না লাগলে আপনি আর কষ্ট করবেন না। আমিই পীরসাহেবকে বলব।
হাশেম	-	না না; আমি কি আর সে ধরনের ভালো না লাগার কথা বলেছি। তবে মনে হয়, পীরসাহেবের মতো অত ধৈর্য আমার নাই। যখন আম্মা দরজা খুলে আপনার কথাটা পীরসাহেবকে বলে দিলেন, তখন ভাবলাম, এখুনি কিছু একটা ঘটে যাবে। কিন্তু পীরসাহেব সাবধানী লোক। সজোরে শোকর আদায় জানিয়ে সংযত হয়েই থাকলেন, খাওয়া-দাওয়া করলেন, তারপর একটু বিশ্রামও করলেন। এমন একটা ভাব যেন কোথাও কোনো দ্বন্দ্ব নেই, সবই ঠিকঠাক আছে, তিনি কেবল সস্ত্রীক কুটুম্ব বাড়ি বেড়াতে এসেছেন। আসলে বেড়ালের ভাব, ইঁদুরকে থাবার নিচে পেয়ে বিড়ালের যে ভাব হয়, সেই ভাব।
খোদেজা	-	হাশেম।
হাশেম	-	(কান না দিয়ে) তারপর ধীরেসুস্থে প্রস্তাবনা শুরু হলো এ-কথা সে-কথা, পীরসাহেব তাঁকে ঝেড়ে দিতে পর্যন্ত প্রস্তুত। তাঁর বিবির কাঁধে যে শয়তান চড়েছে সে শয়তানকে ঝেড়ে নামিয়ে দেবেন। কিন্তু সব কথাতেই তাঁর বিবি কেবল না করেন। পীরসাহেব সব শোনেন আর মাথা নাড়েন। কিন্তু দেখে মনে হয় তাঁর চোখটা যেন হিংস্র জন্তুর মতো দপ করে জ্বলে ওঠে।
খোদেজা	-	(রেগে) হাশেম এখানে বসে এত বেতমিজি কথা শুনতে পারি না। পীরসাহেবকে নিয়ে এসব কী কথা বলিস। দিলে কী একটু ভয়-ডর নাই?
হাশেম	-	আছে আম্মা, ভয়-ডর আছে! না হলে কি একটি মেয়ে এমন করে পালায়? আর আমিই কী কেবল বার্তাবাহকের মতো এ-কামরা সে-কামরার মধ্যে ঘুরঘুর করি?
খোদেজা	-	তোর এত ঘুরঘুর করার কোনোই প্রয়োজন দেখি না। তাহেরা যা বলছে তাই পীরসাহেবকে গিয়ে বল। শুনে তাঁর যা খুশি তা-ই তিনি করবেন।
হাশেম	-	(বিরক্ত হয়ে) বলব আম্মা, বলব । তবে সুখবর যখন নয়, অত লাফিয়ে গিয়ে বলবারই কী প্রয়োজন? তাছাড়া ব্যাপারটা কেমন সঙ্গীন হয়ে উঠছে দেখতে পারছেন না? প্রথমে আদর-আবদার, মিষ্টি মিষ্টি কথা, তাতে কোনো ফল না হওয়ায় এখন উঠেছে পুলিশের কথা। তিনি সঙ্গে না গেলে পীরসাহেব পুলিশে খবর দেবেন, তাঁর বাপজানকে খবর দেবেন। কিন্তু তাতেও তাঁর বিবি ভয় পাচ্ছেন না। বলছেন, জুলুম করে কোনো ফল হবে না। জুলুম করলে তিনি সত্যি পানিতে ঝাঁপ দিয়ে, না হয় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করবেন।
খোদেজা	-	(রেগে আপন মনে) ঐ এক কথা, আত্মহত্যা করব । মেয়েটার ঘাড়েই শুধু শয়তান বসে নাই, তার ভিতরেও শয়তান। আর সে শয়তান তোর ঘাড়েও যেন চেপেছে।
হাশেম	-	কার ঘাড়ে শয়তান চেপেছে কে জানে। এই বুড়ো বয়সে একজন মেয়ের পেছনে ছোটার নেশা কি এমনিতেই হয়?
খোদেজা	-	হাশেম, হাশেম। আমার সামনে এসব কী বেয়াদবি।
হাশেম	-	আম্মা, একটা কথা বুঝে দেখবেন। পীরসাহেবের সঙ্গে তাঁর যে বিয়ে, সে বিয়ে কেবল নামেই বিয়ে। তিনি হ্যাঁ বলেন নাই। কোনোভাবে মতও দেন নাই।
খোদেজা	-	তোর বাপের সঙ্গে যখন বিয়ে হয় তখন আমিই কি আর হ্যাঁ বলেছিলাম? বিয়ের ব্যাপার কি আইন-মকদ্দমা নাকি?
হাশেম	-	আইন-মকদ্দমা নয় বলেই তো এত কথা উঠেছে। আপনি হ্যাঁ বলেননি লজ্জায়, আর উনি হ্যাঁ বলেননি মত ছিল না বলে। মত না থাকলে কোনো বিয়ে জায়েজ হতে পারে না, এ বিয়েও

জায়েজ হয়নি। যদি জায়েজ হতো, যদি তিনি পীরসাহেবের ঘর-সংসার করে পালিয়ে যেতেন তাহলে পীরসাহেবের পক্ষ নিয়ে কথা বলাটা হয়তো যুক্তিসঙ্গত হতো। সে কথা যাক, কিন্তু তাঁর প্রতি একটু দয়া-মায়াও কি হয় না আপনার। কাল যাঁকে আদর করে ডেকে নিয়ে আশ্রয় দিলেন, যে আজ সারা দিন আপনার সাথে থেকে রান্নাবান্নার কাজ করলো, যাঁর চুলও বেঁধে দিলেন মগরেবের আগে, তাঁর ওপর একটু মমতাও হয়না?

খোদেজা - (হঠাৎ ভিন্ন গলায়) মমতা হলেই বা কী করব? মমতা তো হয়ই। আমার মেয়ে নেই। ও যে সারা দিন আমার পাশে বসে টুকটাক কাজ করল তা বেশ ভালোই লাগল। কিন্তু তার কপাল খারাপ, আমরা কী করতে পারি? পীরসাহেব যদি না আসতেন, তবে অন্য কথা ছিল। তিনি পাশের ঘরেই আছেন। তিনি এ কথাও জানেন যে, তাঁর বিবি এখানে আছে। তার ওপর তিনি এও চাইছেন যে তাঁর বিবি তাঁর সঙ্গে যেন ফিরে যায়। তোকে বারবার বলেছি, পীরসাহেবকে অসন্তুষ্ট করে তাঁর বদ্‌দোয়া মাথায় নিতে আমি রাজি নই। তা ছাড়া আমাদের করারও আর কিছুই নাই। ও যা বলেছে পীরসাহেবকে গিয়ে বল। তিনি পুলিশ ডাকুন বা তার বাপকে খবর দিন তা তাঁর মর্জি।

বহিপীর - হাশেম মিঞা। কোথায় গেলেন হাশেম মিঞা (হাশেম আর দ্বিরুক্তি না করে পাশের ঘরে চলে যায়।)

হাশেম - পীরসাহেব, তিনি ঐ একই কথা বলছেন। বলছেন যে পুলিশ ডাকলে বা তাঁর বাপকে খবর দিলে তিনি পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবেন। কেউ নাকি ঠেকাতে পারবে না।

বহিপীর - হু! (ভাবিত হন। তারপর) দেখুন। মধ্যের দরজাটা একটু খুলিয়া দিন আমিই তাঁহার সঙ্গে আলাপ করি। আপনি সে ঘরে গিয়া কী করেন বুঝি না। (হাশেম দরজাটা সামান্য খুলে দেয়। পীরসাহেব একটা মোড়া টেনে নিয়ে দরজার কাছে বসেন।)

বিবি সাহেব–

তাহেরা - (বাধা দিয়ে উচ্চ স্বরে) আমাকে বিবি সাহেব ডাকবেন না। বিয়েতে আমি মত দিই নাই। আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি।

বহিপীর - (একটু রেগে) আপনি মত না দিলেও আপনার বাপজান দিয়াছেন। তাহা ছাড়া সাক্ষী-সাবুদ সমেত কাবিননামাও হইয়া গিয়াছে। এখন সে কথা বলিলে চলিবে কেন। (সুর বদলিয়ে) দেখুন, মন দিয়া আমার কথা শুনুন।

তাহেরা - (আবার বাধা দিয়ে) আমি আপনার কোনো কথা শুনতে চাই না। আমার বাপজান আর সৎমা আপনাকে খুশি করার জন্য আপনার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। আমি যেন কোরবানির বকরি। আপনি পুলিশে খবর দিতে পারেন, আপনি আমার বাপজানকে ডেকে পাঠাতে পারেন, আমার ওপর জুলুম করতে পারেন। কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে যাব না। আপনি আমাকে দেখেননি, আমিও আপনাকে দেখিনি। আর আপনাকে আমি দেখতেও চাই না।

খোদেজা - খোদা খোদা, কোথায় যাব আমি। পীরসাহেবের মুখের ওপর এসব কী কথা বলে মেয়েটা! শুনেই আমার বুকের ভেতরটা কাঁপে।

বহিপীর - আমার কথা শোনেন।

তাহেরা - না না, আপনার কোনো কথা আমি শুনতে চাই না।

বহিপীর - (হঠাৎ রাগে আত্মহারা হয়ে) হকিকুল্লাহ্! হকিকুল্লাহ্! (হকিকুল্লাহ্ দ্রুতপায়ে ভেতরে আসে।) যাও, পুলিশ ডাকিয়া লইয়া আসো। বহুত আদর-আবদার হইয়াছে, আর নয়। আমার মান-সম্মান যাক, তবু পুলিশ ডাকিয়া আনো। ঘাটে পুলিশ আছে, যাও হকিকুল্লাহ্ তাদের ডাকিয়া নিয়া আসো।

হকিকুল্লাহ্ - জি হুজুর, এই ডেকে আনি।

(পরমুহূর্তেই বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। চিৎকার শুনে চাকরটা আর দুজনে উঠে বসে।)

হাশেম - পীরসাহেব। পুলিশ ডাকতে পাঠিয়ে ভুল করলেন, পীরসাহেব।

[পাশের ঘরে তাহেরা হঠাৎ ক্ষিপ্রগতিতে উঠে পড়ে ঘরে গিয়ে বেঞ্চিতে হাঁটু গেড়ে বসে জানলা দিয়ে গলা বের করে দিতেই খোদেজা লাফিয়ে উঠে দুহাতে তার কোমর জড়িয়ে ধরেন।]

খোদেজা - হাশেম। এ যে গেল, গেল মেয়েটা, আমি আর তাকে ধরে রাখতে পারছি না।

[হাশেম ধা করে পীরসাহেবকে ডিঙিয়ে পাশের ঘরে যায়, গিয়ে তাহেরার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ভেতরে নিয়ে আসে। পীরসাহেব ত্বরিত গতিতে উঠে দরজার সামনে দাঁড়ান, চোখ তাঁর বিস্ফারিত। চিৎকার শুনে হকিকুল্লাহ্ও দ্রুতপায়ে পীরসাহেবের পেছনে এসে দাঁড়ায়।)

বহিপীর - হাশেম বাবা, আপনি তাঁর হাত ছাড়িয়া দিন। আমার বিবির গায়ে হাত দিবেন না।

হাশেম - (রুক্ষ স্বরে) হাত না দিলে তাঁকে বাঁচাত কে? (হাত ছেড়ে দেয়।)

খোদেজা - খোদা খোদা, আমার মাথা ঘুরছে। (হকিকুল্লাহ্র দিকে চোখ পড়ায়) ও কে আবার উঁকি মারছে। কী হচ্ছে এই বজরায়? উনি কোথায় গেলেন?

হকিকুল্লাহ্ - (কেশে) আমি হকিকুল্লাহ্, হুজুরের লোক।

বহিপীর - (ঘুরে দাঁড়িয়ে) হকিকুল্লাহ্। তুমি যাও নাই পুলিশ ডাকিতে? জিব্রাইলের মতো আমার কাঁধের উপর দাঁড়াইয়া এখানে কী করিতেছ? না না এ কী হইল; কেহ কোনো কথা শুনিতেছে না। (সরে গিয়ে হতাশভাবে পীরসাহেব বেঞ্চিতে বসেন।)

হকিকুল্লাহ্ - (সরে গিয়ে) ছোট মুখে বড় কথা, কিন্তু আমি একটু ভাবছিলাম হুজুর।

বহিপীর - (বিস্ময়ে) ভাবিতেছিলে? তুমি ভাবিতেছিলে?

হকিকুল্লাহ্ - জি। ভাবছিলাম, আপনি হয়তো রাগের মাথায় পুলিশ ডাকার কথা বলেছেন। ডেকে ফেললে পরে না আফসোস করেন।

বহিপীর - না না ব্যাপার কিছুই বুঝিতেছি না। হকিকুল্লাহ্ পর্যন্ত ভাবিতে শুরু করিয়াছে, যাক, ভালোই করিয়াছ, ইহা পুলিশের ব্যাপার নহে। পুলিশ কীই বা করিতে পারে। হকিকুল্লাহ্, একটু হাওয়া করো। মাথাটা গরম হইয়া উঠিয়াছে।

(হকিকুল্লাহ্ পাখা নিয়ে হাওয়া করতে শুরু করে।)

হাতেম আলি - (হঠাৎ জেগে উঠে) চারপাশে কী হচ্ছে? কিসের এত চেঁচামেচি?

বহিপীর - (মুখ চিবিয়ে) কী আবার হইবে। একটু হাওয়া খাইতেছি।

তাহেরা - (বাহুতে হাত বোলাতে-বোলাতে) আপনি আমাকে ব্যথা দিয়েছেন।

খোদেজা - ব্যথা দিয়েছে ভালো করেছে। ও না এসে তোমাকে ধরলে কে বাঁচাত তোমাকে? মেয়ে আবার পানিতে ঝাঁপ দিতে চায়। শাবাশ মেয়ে।

তাহেরা - আমাকে বাঁচানোর জন্য আপনাদের এত মাথাব্যথা কেন?

হাশেম - (রেগে) চোখের সামনে মরতে দেখব নাকি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?

তাহেরা - বুঝেছি। আপনারা কোরবানির গোস্ত খেতে পারেন, কিন্তু গরু জবাই চেয়ে দেখতে পারেন না। আপনারা ভেবেছেন সত্যি সত্যি আমি পানিতে ঝাঁপ দিতাম? নিজের জান দেওয়া কি অতই সোজা? আপনাদের বুদ্ধি নাই।

খোদেজা - খোদা খোদা। এবার মেয়েটির মুখে অন্য কথা শুনি। বলে কিনা আমাদের বুদ্ধি নাই।

হাশেম - আপনি বুঝতে পাছেন না আম্মা। তিনি এখন আমাদের রাগাতে চান।

তাহেরা - আপনাদের রাগিয়ে আমার লাভ কী, আপনারা ছেড়ে দিলে আমি যাব কোথায়? (সে বাহুতে হাত বোলাল আর একবার তির্যক দৃষ্টি হাশেমের দিকে তাকায়।)

খোদেজা - (দুজনের দিকে তাকিয়ে) এসব আবার কী হেঁয়ালি চলছে। হাশেম। তুই এখানে এত ঘুরঘুর করিস না তো। বাপের খোঁজখবর নেওয়া নাই, এ ঘরে জোঁকের মতো লেগে আছে। দ্যাখ তোর বাপের কী হয়েছে। বজরায় এত হুলস্থুল, তবু তার কোনো সাড়াশব্দ নাই।

হাশেম - আম্মা, আমি যাচ্ছি কিন্তু আগে আমার একটা কথা শোনেন। পীরসাহেব পাশের ঘরে চুপচাপ বসে। এখন এবাদত করতে বসেননি; তিনি নতুন ফন্দি-কৌশল ভাবতে বসেছেন। কীভাবে তাঁকে নিয়ে যাবেন, কী চাল চাললে তিনি আর ফসকে যাবেন না, সেসব চিন্তা করছেন।

খোদেজা - তোর মুখের কথাও যেন লাগামছাড়া হয়েছে। নিজের বিবিকে কীভাবে বশে আনবেন সে কথা নিয়ে চিন্তা করলে ফন্দি-কৌশল আঁটা হয় বুঝি।

হাশেম - সেটা অন্য কথা! আমি বলতে চাই যে, যতই ফন্দি-কৌশল আঁটেন না কেন, আমি দেখব যাতে তাঁর কোনো ফন্দি-কৌশল না খাটে, কারণ, ওঁর যদি মত থাকে, তবে আমি তাঁকে বিয়ে করব। কথাটা আপনার সামনেই বললাম।

খোদেজা - বিয়ে, বিয়ে করবি তাকে? এ কী কথা বললি? মেয়েটা তোর মাথা খেল নাকি। খোদা খোদা। আমি খাল কেটে ঘরে যেন কুমির এনেছি, হাশেম। তুই এখান থেকে এক্ষুনি বের হ? এ ঘরে আর আসতে পারবি না। পীরসাহেবকে যা বলবার হয় আমিই বলব। এক পীরসাহেবের বিবি, তাকে নাকি আমার ছেলে বিয়ে করবে। তা ছাড়া কী মেয়ে! যে মেয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে আত্মীয়স্বজন ছেড়ে পালাতে পারে সে কী করে ভালো মেয়ে? যা যা, এ কামরা থেকে যা হাশেম।

হাশেম - আপনি বলছেন তিনি পীরসাহেবের বউ কিন্তু দুজন সাক্ষীর সামনে একটা কাগজে কী লেখাপড়া হয়েছে তার কোনোই দাম নাই। সামনে থাকলে আমি এখনই সেটা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলতাম। আমি পীরসাহেবকে গিয়ে বলছি সে কথা। আমার আর ভয়-ডর নাই। আর আমি কাউকে ভয় করি না।

তাহেরা - আমার তাতে মত থাকবে সে কথা আপনাকে কে বললো?

হাশেম - (হঠাৎ দমে গিয়ে) তাই, তাই। তবে আপনার কাছে সেকথা আমি বলি নাই।

তাহেরা - না বললেও আপনি তাই ধরে নিয়েছেন।

খোদেজা - (বিস্ময়ে) আমার ছেলে তোমাকে বিয়ে করতে চাইলে তুমি তাতে মত দেবে না।

তাহেরা - সে কথাও আমি বলি নাই। তবে একজন ঝোঁকের মাথায় কেবল বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যই যদি কাউকে বিয়ে করতে চায়, তবে সে অত সহজেই মত দেবে কেন? ঝোঁক কেটে গেলে আপনার ছেলের মত হতে পারে, তিনি ভুল করছেন।

খোদেজা - (আগের মতো বিস্ময়ে) আমাদের মধ্যে আমার ছেলেটাই তোমার জন্য এত করছে। আর তার কথায় তুমি মত দেবে না?

তাহেরা - (একটু হেসে) হঠাৎ আপনি যেন চাইছেন আপনার ছেলের কথায় আমি মত দিই।

খোদেজা - না না, সে কথা নয়। তোমাদের বিয়ে তো আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি তোমার অকৃতজ্ঞতা দেখে। সে জন্যই কথাটা বলছি।

হাশেম - আম্মা, উনি কোনোই অকৃতজ্ঞতা দেখাচ্ছেন না। আপনি ওঁর কথা ঠিক বুঝতে পারছেন না। আমিও যা বলতে চাই তা তাঁকে বোঝানো আমার পক্ষে এখন সম্ভব নয়। সব কথা এক মুহূর্তে বোঝাও যায় না, বোঝানোও যায় না। তিনি যদি মনে করেন আমি ঝোঁকের মাথায় তাঁকে বিয়ে করতে চাইছি সেকথা সত্যও হতে পারে। তা সত্য কি মিথ্যা সে কথা জানতে হলে সময় নেবে। (তাহেরার দিকে তাকিয়ে) কিন্তু আপনাকে আমি কি সাহায্য করতে পারি না?

তাহেরা - (নরম গলায়) আমাকে অকৃতজ্ঞ ভাববেন না। আপনারা সকলেই আমাকে সাহায্য করেছেন বলেই তো মনে সাহস পাচ্ছি। আপনার আম্মা থেকে থেকে আমাকে কথা শোনাচ্ছেন বটে কিন্তু তিনিও আমাকে সাহায্য করছেন। ইচ্ছা করলে তিনি কি আমাকে বের করে দিতে পারেন না?

খোদেজা - (হৃদয়ে টান পড়া গলায়) হয়েছে হয়েছে এত ঢঙের কথা শুনতে পারি না। হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে উঠে বসে ডাকেন, হাশেম, ঐ যে তোর আব্বা তোকে ডাকছেন। তাঁর কথা আমরা সাবাই যেন ভুলেই গেছি। (কঠিন হয়ে) যা হাশেম। আর তোকে বলে রাখছি, ওসব সাহায্যটাহায্যের কথা আমি বুঝি না, বিয়ের কথা তো দূরে থাক। আর এ ঘরেও তোর কোনোই প্রয়োজন নেই। পীরসাহেবকে যা বলার আমিই বলব।

হাশেম - আমার কথাটা খেলোভাবে নেবেন না আম্মা। আমি মন থেকেই কথাটা বলছি।

তাহেরা - (একটু হুকুমের সুরে) যান আপনি পাশের ঘরে। দেখে আসুন আপনার আব্বা কেন ডাকছেন।

খোদেজা - (তাহেরার দিকে চেয়ে) এখন তোমার হুকুমই সে বোধ হয় শুনবে।

হাশেম - (হঠাৎ যেতে যেতে বিরক্তভাবে) যাচ্ছি, যাচ্ছি, আপনার কথা শুনেই যাচ্ছি।
(পাশের ঘরে গিয়ে) আব্বা, আমাকে ডাকছিলেন?

হাতেম আলি - (চমকে উঠে) হ্যাঁ বাবা, তোমাকে ডেকেছিলাম। বসো। তোমাদের কথাটা বলার সময় এসেছে। শুধু একটা রাত; একটা রাত কথাটা ঢেকে রেখে লাভ কী?

হাশেম - (সভয়ে) আব্বা কী কথা বলবেন আপনি। কী কথা আর ঢেকে রেখে লাভ নাই?

হাতেম আলি - অস্থির হয়ো না; অস্থির হয়ে লাভ নাই বাবা। দেখো না আমার মধ্যে সমস্ত অস্থিরতার শেষ হয়েছে। আমার মনে আর কোনো ভয়-আশঙ্কা নাই, কোনো অস্থিরতা নাই। শুধু বড় ক্লান্তবোধ করছি। (থেমে) না, এখন আর বলতে কোনো বাধা নাই। বাবা, তোমাদের কাছে একটা মিথ্যা কথা বলেছিলাম। আমার কোনো অসুখ হয় নাই, দাওয়াই করার জন্যও আমি শহরে আসি নাই। এসেছিলাম জমিদারি রক্ষা করতে।

হাশেম - (বিস্ময়ে) জমিদারি রক্ষা করতে?

হাতেম আলি - হ্যাঁ। কিন্তু রক্ষা করতে পারলাম না। কাল জমিদারি নিলামে উঠবে।

হাশেম - কাল জমিদারি নিলামে উঠবে?

হাতেম আলি - শহরে টাকার জোগাড় করতে এসেছিলাম। জোগাড় হলো না। জমিদারি বাঁচানোর আর কোনো পথ নাই। মধ্যে কেবলমাত্র একটি রাত, তারপর বুদবুদের মতো জামিদারি শূন্যে মিলিয়ে যাবে, আর সজ্ঞানে সুস্থ দেহে আমাকে তাই চেয়ে চেয়ে দেখতে হবে, করার কিছুই থাকবে না।

[স্তম্ভিতভাবে বাপের মুখের দিকে কতক্ষণ চেয়ে হাশেম ধীরপায়ে পাশের কামরায় যায়, গিয়ে বেঞ্চিতে বসে মেঝের দিকে চেয়ে মূর্তিবৎ বসে থাকে। খোদেজা উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তাহেরার চোখেও উৎকণ্ঠা আসে।]

খোদেজা - তোর আব্বা কী বললেন? হাশেম! কথা বলিস না কেন?

হাশেম - কাল আমাদের জমিদারি নিলামে উঠবে।

খোদেজা - নিলামে উঠবে। কেন কেন? (স্তম্ভিত হাশেম এবার দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করে।)

তাহেরা - (চমকে উঠে) আপনার ছেলে যে কাঁদছে!

হাশেম - (সংযত হয়ে নাক ঝেড়ে) আমি কী আর জমিদারি যাচ্ছে বলে কাঁদছি নাকি। কান্না এলো আব্বার কথা ভেবে। তাঁর চোখে পানি নাই বটে, কিন্তু দুঃখে বুক নিশ্চয় ফেটে যাচ্ছে।

হাতেম আলি - (উঠে এসে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে) আমার ছেলেটাকে ছাপাখানা করার পয়সা কখনো দিতে পারব না।

হাশেম - (চেঁচিয়ে) আমি পয়সা চাই না। আমি পয়সাও চাই না, ছাপাখানাও চাই না। [হাতেম আলি আবার নিঃশব্দে ফিরে যান।]

(উঠে পায়চারি করতে করতে আপন মনে) আমার কী আসে যায়। জমিদারি থাক বা না থাক আমার তাতে কিছু আসে যায় না। পড়াশোনা করেছি, এটা না হয় সেটা হবে, কিছু একটা করে খেতে পারবই। একটা স্বপ্ন ভেঙে গেলে আরেকটা স্বপ্ন গড়তে পারব। কিন্তু আব্বার কী হবে? এই বয়সে কী স্বপ্নই বা তিনি গড়তে পারেন? আশ্চর্য, আমরা সত্যিই ভেবেছিলাম তাঁর অসুখ হয়েছে। কিন্তু কী নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণাটি না তিনি ভোগ করেছেন যে কেবল তার মুখের দিকে তাকিয়েই সে কথা বিশ্বাস করেছি। যে মানসিক যন্ত্রণা দুদিনে শরীরকে ভেঙে দেয় সে মানসিক যন্ত্রণা কঠিন অসুখের চেয়ে কষ্টকর (থেমে মায়ের দিকে তাকিয়ে) আম্মা, কী হবে আব্বার? কী নিয়ে শেষ জীবনটা কাটাবেন?

তাহেরা - কেন, আপনারা থাকবেন আপনি থাকবেন, আপনার আম্মা থাকবেন।

হাশেম - জমিদারি! জমিদারি কী? কত জমিদারি এসেছে-গিয়েছে। আজ মাটি খুঁড়লেও কত কত বিশাল জমিদারির কোনো নিশানা পাওয়া যাবে না। তার তুলনায় আমাদের আর কীই বা ছিল। তাও না হয় আজ যাবে, কী আসে-যায় তাতে। আব্বাকে তাঁর এই শেষ বয়সে সে কথা কে বোঝাবে?

[বহিপীর হঠাৎ উঠে আসেন, এসে খোলা দরজার সামনে দাঁড়ান]

বহিপীর - বিবি। বহুত হইয়াছে, আর ফ্যাঁকড়া তুলিবেন না। দেখুন, তাঁহাদের কাহার মনে শান্তি নাই। সকলেই কেমন বেচইন হইয়া পড়িয়াছেন। এই পারিবারিক দুশ্চিন্তার সময় তাঁহাদের ঘাড়ে চাপিয়া থাকিয়া তাঁহাদের আরও কষ্ট দেওয়া ঠিক হইবে না। আসুন, আমরা চলিয়া যাই। ও বিবি।

[তাহেরা তাঁর কথায় কান না দিয়ে পায়চারি করতে থাকা হাশেমের দিকে চেয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে।]

(অপেক্ষা করে) হুঁ। [তিনি স্বস্থানে আবার ফিরে যান, গিয়ে গুম হয়ে বসে থাকেন। পাশের ঘরে হাশেম পায়চারি বন্ধ করে হঠাৎ লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে বেঞ্চির ওপর। মাঝে মাঝে খোদেজা, হাশেম আলাপ করে। সে আওয়াজ শোনা যাবে না।]

হকিকুল্লাহ্। ব্যাপারটা আমার কাছে ভালো ঠেকিতেছে না।

হকিকুল্লাহ্ - জি।

বহিপীর - (রেগে) কী বুঝিলে যে জি বলিলে? যাও তুমি এখন যাও। আমি জমিদার সাহেবের সঙ্গে একটু কথা বলি। (হকিকুল্লাহ্‌র প্রস্থান। বাইরে গিয়ে আবার হুঁকা ধরাবে।) জমিদার সাহেব।

হাতেম আলি - আমাকে ডাকছেন পীরসাহেব?

বহিপীর - বলি, এতটা ভাঙ্গিয়া পড়িলে চলিবে কেন? খোদার উপর আস্থা রাখিবেন।

হাতেম আলি - জি, পীরসাহেব আস্থা রাখছি বৈকি।

বহিপীর - তাঁহার ছেফাত যেমন অসাধারণ, তেমনি অসংখ্য। তাঁহার স্বরূপ আমাদের কল্পনাতীত কিন্তু তাঁহার ছেফাতের এক-আধটু পরিচয় আমরা সকলেই পাই। তাহার জন্য এবাদত করিতে হয় না। তাঁহার ছেফাতের উপর আস্থা রাখিবেন।

হাতেম আলি - সব আস্থা আছে পীরসাহেব, সব আস্থা আছে। কিন্তু এই যে রাতটি ক্রমে ক্রমে গভীরতর হচ্ছে আর তার মুহূর্তগুলি একটার পর একটা নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছে, এ রাতটিকে তো এড়াতে পারব না, এ রাতকে কেউ ঠেকাতে পারবে না। পারবে কি পীরসাহেব?

বহিপীর - খোদা কী না পারেন জমিদার সাহেব।

হাতেম আলি - (ব্যঙ্গ করে) জমিদার সাহেব। ডাকটা এখন কেমন ঠাট্টার মতো শোনায়। জমিদারি নাই, তবু জমিদার।

বহিপীর - আমি তা মনে করি না। জমিদার সাহেবকে জমিদার সাহেব ডাকিব নাতো কী ডাকিব?

হাতেম আলি - (একটু হেসে) সেটা আপনার মেহেরবানি পীরসাহেব।

বহিপীর - না, মেহেরবানি নয়, খাঁটি কথা। কারণ, আপনার জমিদারি যাইবে না।

হাতেম আলি - (চমকে উঠে বিস্ময়ে) আপনার কথা বুঝলাম না পীরসাহেব।

বহিপীর - বলিলাম। আপনার জমিদারি যাইবে না।

হাতেম আলি - (বিস্ফারিত নেত্রে) পীরসাহেব, আমার মাথার অবস্থা এখন ঠিক নেই। আপনার কথা যেন ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি কী বলছেন যে আমার জমিদারি যাবে না?

বহিপীর - ঠিক, আপনার জমিদারি যাইবে না।

হাতেম আলি - (যেন অলৌকিক দৃশ্য দেখছেন) এ কী কথা বলছেন পীরসাহেব। সে কী করে সম্ভব?

বহিপীর - সম্ভব, সম্ভব। দেখুন আপনি শহরে আসিয়াছিলেন টাকা কর্জ করিতে, কিন্তু আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই, আপনার চেষ্টা সফল হয় নাই। কিন্তু জমিদারিটা যাওয়া না-যাওয়া কেবল টাকার ওপরই নির্ভর করিতেছে। সে টাকা আমি আপনাকে কর্জ দিব।

হাতেম আলি - পীরসাহেব!

বহিপীর - (মাথা নেড়ে) অধীর হইবেন না। পহেলা আমার কথা শুনুন। হঠাৎ খেয়াল হইল আপনি যেমন আপনার দুঃখে মুষড়াইয়া পড়িয়া বাহ্যিক সব কিছুর প্রতি অন্ধ হইয়া মানসিক যাতনা ভোগ করিতেছেন, তখন পাশে বসিয়া আমিও আমার সমস্যায় লিপ্ত। তখন আমি ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিলাম দুঃখের কারণ যদি এক না হয়, তবে গভীর দুঃখগ্রস্ত দুটি লোকের মতো অপরিচিত আর কেহ নাই। পাশাপাশি বসিয়াও দুইজনের মধ্যে যেন আসমান-জমিনের প্রভেদ। আমার পাশে বসিয়াই আপনি গভীর বেদনা ভোগ করিতেছেন; যেহেতু জমিদারির সঙ্গে সঙ্গে আপনি আপনার মান-সম্মান খোরাকির ব্যবস্থা সব হারাইতে বসিয়াছেন। জমিদারিই হইল আপনার মূল। মূল কাটিয়া ফেলিলে বৃক্ষ দাঁড়াইতে পারে না; সব বুঝিয়া এবং আপনার পাশে বসিয়া থাকা সত্ত্বেও আপনার দুঃখ আমার মনে কোনো প্রকার দাগ কাটিতেছে না। উহার কারণ আমিও সমস্যাজর্জরিত। বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিয়াছি। বিবির সঙ্গে দেখা হইবার পূর্বেই তিনি পালাইয়া গেলেন। আমি তাঁহাকে খুঁজিতে বাহির হইলাম। ভাগ্যের কী খেলা আর খোদার কী মর্জি, তাঁহাকে এই বজরাতেই পাইলাম। তাঁহার সঙ্গে চাক্ষুষ দেখাও ঘটিল; বলিতে লজ্জা নাই, তাঁহাকে দেখার পর আমার এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হইল যে, তাঁহাকে আমি ফেলিয়া যাইতে পারি না। যে করিয়াই হোক, তাঁহাকে আমি সঙ্গে লইয়া যাইব। কিন্তু সমস্যা গুরুতর। তাঁহাকে

২০১৬

টলাইতে পারি না, তিনি আমার হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য পানিতে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিতে পর্যন্ত প্রস্তুত। অবশ্য জোর-জুলুম করা যায়। জোর-জুলুম করিয়া পাগলা হাতিকেও বশ করা যায়, কিন্তু মানুষ তো আর জন্তু নয়। ভাবিলাম, অন্য কোনো পথ ধরিতে হইবে! আরও ভাবিলাম, আপনি ও আমি এক কামরায় বসিয়াও একাকী দুঃখ ভোগ করিতেছি, কেহ কাহার সাহায্যে লাগিতেছি না। ভাবিলাম, আমাদের দুইজনের সমস্যাকে জড়িত করিলে দুইজনের সমস্যারও হয়তো সমাধান হইতে পারে, না হইলেও অন্তত‌পক্ষে দুঃখে মিলিত হইয়া আমরা পরস্পরের দিলে কিছুটা শক্তি আনিতে পারি। আপনি আমার কথা বুঝিতেছেন তো?

হাতেম আলি - এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না, কিন্তু মন দিয়ে শুনছি পীরসাহেব।

বহিপীর - আরও বলি, শুনুন। লোকেরা বলে, খোদা আমার দেলে রুহানি শক্তি দিয়েছেন। কিন্তু সে কথা আমি জানি না। আমি উদার লোক। বহুরূপীকে যেমন বহুরূপী হইবার জন্য সঙ সাজিতে হয়, তেমনি পীর হইতে হইলে তাহাকে পীরের সঙ ধরিতে হইবে–এ কথা আমি মানি না। কিন্তু রুহানি শক্তি থাকুক বা না থাকুক, আমি টক করিয়া মানুষের মনের কথা বুঝিতে পারি। শুধু এক নজর দেখিলেও বিবিকে আমার চিনিতে দেরি হয় নাই। স্নেহবিবর্জিতভাবে সৎমায়ের ঘরে মানুষ-হওয়া আমার মাতৃহারা বিবিটি জীবনে কখনো স্নেহ-মমতা পান নাই। দায়িত্বের খাতিরে তাঁহার বাপজান তাঁহার ভরণ-পোষণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু স্নেহ-মমতা দেন নাই। দায়িত্বের খাতিরে দায়িত্ব পালন করা আর স্নেহ-মমতার খাতিরে দায়িত্ব পালন করার মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক। কাজেই যেখানেই আমার বিবি একটু স্নেহ-মমতার আভাস পাইবেন, সেখানেই তাঁহার সমস্ত দিল হইতে কৃতজ্ঞতা উথলাইয়া উঠিবে। এ কৃতজ্ঞতার তেজ নেশার মতো। ইহার ঘোরে মানুষ অনেক কিছুই করিতে পারে। কাজেই আপনাদের নিকট তিনি যে সামান্য স্নেহ-মমতার আভাস পাইয়াছেন, তাহারই প্রতিদানস্বরূপ তাঁহাকে যাহাই বলিবেন তিনি তাহাই করিবেন।

হাতেম আলি - পীরসাহেব, মেহেরবানি করে আরও খুলে বলুন।

বহিপীর - আসল কথা বলিবার আগে আরেকটা কথা বলিয়া লই। আপনি ভাবিতে পারেন, আমি পীর মানুষ, আমি অত টাকা কোথায় পাইব যাহার দ্বারা আপনার জমিদারি উদ্ধার করা যাইতে পারে। কিন্তু খোদা আমাকে যথেষ্ট অর্থ দিয়াছেন। তা ছাড়া খোদারই মর্জি, তিনি আমাকে অনেক ধনী মুরিদও দিয়াছেন, যাঁহাদের কাছে হাত পাতিলেই যাহা চাহিব তাহাই তাঁহারা দিবেন। মাটিকে সোনা করিবার কেরামতি আমার জানা নাই, কিন্তু একবার মুখ খুলিয়া চাহিলেই আমার মুরিদগণ ভিটাবাড়ি বন্ধক দিয়া হইলেও আমার অনুরোধ রক্ষা করিবেন। কিন্তু আমি কখনো কাহার কাছে এমন অনুরোধ জানাই নাই। আমার অর্থের কী প্রয়োজন। যাহা আমার আছে তাহাও আমি বিলাইয়া দিতে পারি। এক এক সময় ভাবি, সব ছাড়িয়া ফেলিয়া সত্যিই চলিয়া যাই যেদিকে চোখ যায়, গুহা-গহ্বরে, অরণ্য-পর্বতে ও ইরান-তুরান-কাবলিস্থানে—যেখানেই নিরিবিলি একাকী খোদার এবাদত করা যায়। কিন্তু উহা স্বপ্ন, পীরের স্বপ্ন থাকে। আসলে আমি ইহাই ভাবি যে, সমস্ত ত্যাগ করিলে এবাদত হয় না, কারণ সমস্ত ত্যাগ করিলে মানুষ আর মানুষ থাকে না, অমানুষে পরিণত হয়। শূন্যতার মধ্যে শূন্যতাই সম্ভব; যেখানে রুহ-এর মুক্তি মিলে না। তাহা হইলে খোদা কেবল আসমানই সৃষ্টি করিতেন, জমিন করিতেন না। অবশ্য অর্থ-যশ-মানের লোভ ত্যাগ করিতেই হয়, কিন্তু জীবনে সামান্য ঘনিষ্ঠ স্নেহ-মমতার সিঞ্চন না থাকিলে কোনো এবাদতই সম্ভব নয়। পানির অভাবে বৃক্ষ যেমন শুকাইয়া মরিয়া যায়, তেমনি সামান্য স্নেহ না থাকিলে রুহও মরিয়া যায়। তখন এক ঢোক পানি না পাইলে ঐশী প্রেমের সাধনা করা যায় না। সেই কারণেই আমি আমার বিবিকে চাই। আপনি অবশ্য বলিতে পারেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাই না কেন, যাইতাম, যদি না তাঁহার মধ্যে একটি অসাধারণ নারীর পরিচয় পাইতাম।

পালাইয়া যাওয়া কাপুরুষের লক্ষণ, পালাইয়া যাওয়াটা অতি সহজও। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তিনি পালাইয়া অতিশয় বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন, সহজ এই কাজটা কেহ কোনো দিন করিতে পারে না বলিয়াই তাহা করিয়া তিনি অসাধারণত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাকে আমি কী করিয়া ফেলিয়া যাই? আমি এখনো জানি যে, জীবনে কখনো স্নেহ-মমতা না পাওয়ার জন্য তিনি এই কথা সহজে বিশ্বাস করিতে চান না যে, তাহা সত্যই পাওয়া যায়। সেই জন্যই তিনি আমাকে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু একবার কোনো প্রকারে আমি যদি তাঁহাকে আমার স্নেহ-মমতার পরিচয় দিতে পারি, তিনি আমার নিকট হইতে আর পালাইতে চাহিবেন না। সেই পরিচয় দিবার একটা সুযোগই আমি চাই, এবং সেই কারণেই আপনার সমস্যা আর আমার সমস্যাকে মিলিত করিতে উদ্‌গ্রীব। এইবার আমার প্রস্তাবিত কথা আপনাকে বলি, শুনিতেছেন জমিদার সাহেব?

হাতেম আলি - জি পীরসাহেব, শুনছি, মন দিয়ে শুনছি।

বহিপীর - প্রশ্ন করি বলিয়া তাহা মনে করিবেন না। সারা জীবন বাঁধা-ধরা কথা বলিয়াছি, লোকেরা শুনিয়াছে কী শুনে নাই, তাহা লইয়া বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাই নাই। কিন্তু অকস্মাৎ কখনো মৌলিক কথা বলিতে থাকিলে ভয় হয় উহা বুঝি কেহ শুনিল না। দুনিয়ায় হাজার হাজার লোক লক্ষ লক্ষ ফুলগাছ রোপণ করে, আপনি আপনার আঙিনার একটা গাঁদা ফুলের গাছ রোপণ করিলেও তাহা সকলকে ডাকিয়া দেখাইতে আপনার ইচ্ছা হয়। যা হোক আমি বলিয়াছি, আপনাকে আমি টাকা কর্জ দিব। এই শহরেই আমার জনা তিনেক ধনী মুরিদ আছেন। তাঁহাদের কাছে চাহিলেই পাইব। সে টাকা দিয়া আপনি আপনার জমিদারি বাঁচাইতে পারিবেন, উহা আর নিলামে উঠিবে না। তবে একটা শর্তে আপনাকে টাকা কর্জ দিব। তাহেরা বিবিকে আমার সঙ্গে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

হাতেম আলি - (বিস্ময়ে) এই শর্তে যে আপনার বিবিকে আপনার সঙ্গে ফিরে যেতে হবে?

বহিপীর - (জোর দিয়ে) জি, আপনাকে আমি টাকা কর্জ দিব এই শর্তে যে আমার বিবি আমার সঙ্গে ফিরিয়া যাইবেন।

হাতেম আলি - (ইতস্তত করে) আমাকে মাফ করবেন পীরসাহেব, কিন্তু আমি যেন কিছুই আজ বুঝতে পারছি না। আমার জমিদারি থাকা না-থাকার সঙ্গে তাঁর যাওয়া না-যাওয়ার কী সম্পর্ক?

বহিপীর - বেয়াদবি মাফ করিবেন, কিন্তু বিপদে পড়িয়া মানসিক দুঃখকষ্টের ফলে আপনার মস্তক যেন ঘোলাটে হইয়া আছে। তাই আপনার বুঝিতে সময় নিতেছে। যান, সময় বেশি নাই। আপনি ভিতরে গিয়া সকলকে, বিশেষ করিয়া আমার বিবি সাহেবকে কথাটা বলুন। হকিকুল্লাহ্। (হকিকুল্লাহ্ এলে) পিঠটা একটু ভালো করিয়া টিপিয়া দাও। কেমন ব্যথা করিতেছে। (টিপতে শুরু করলে থেকে থেকে বহিপীর আনন্দধ্বনি করবেন) আর দেরি করিবেন না, জমিদার সাহেব, যান ভিতরে গিয়া বলুন। (হাতেম আলি আস্তে উঠে পাশের ঘরে যান। মুখ ভারাক্রান্ত, হাশেম উঠে বসে তাঁর দিকে তাকায়, খোদেজাও।)

হাতেম আলি - (বেঞ্চিতে বসে; তাহেরার দিকে তাকিয়ে) মনের চিন্তায় ছিলাম, ব্যক্তিগতভাবে আপনার খোঁজখবর নিতে পারি নাই। আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন আমার চিন্তার কারণ। আমাদের এত পুরনো জমিদারি ওঠে ওঠে। আগামীকালই তার নিলাম ওঠার তারিখ।

তাহেরা - (আস্তে) জি, শুনেছি।

হাতেম আলি - শহরেও টাকার ব্যবস্থা হলো না; যদিও অনেক আশা ছিল যে হবে। বন্ধু আনোয়ার উদ্দিন সাহায্য করতে পারলেন না। আমি চোখে আঁধার দেখছিলাম। এমন সময় পীরসাহেব আমাকে টাকা কর্জ দিতে রাজি হলেন। আমি তাঁর কাছে টাকা চাই নাই, তিনিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দিতে চেয়েছেন।

২০১৯

হাশেম - পীরসাহেব টাকা দিতে চেয়েছেন।

খোদেজা - খোদা, খোদা। সবই খোদার রহমত।

হাতেম আলি - কিন্তু একটা শর্ত আছে। পীরসাহেব আমাকে টাকা কর্জ দেবেন এই শর্তে যে আপনি তাঁর সঙ্গে ফিরে যাবেন। কিন্তু এই শর্তের আমি কোনোই অর্থ বুঝি না। আপনার সঙ্গে আমার জমিদারির কী সম্পর্ক? তা ছাড়া আপনি এখানে মেহেরবানি করে আশ্রয় নিয়েছেন বটে, কিন্তু আপনি কী করবেন কোথায় যাবেন তার সঙ্গে এ জমিদারির কী সম্বন্ধ? কাজেই এটি কেমনতর শর্ত আমি বুঝতে পারছি না। পীরসাহেব না বলে অন্য কেউ এমন কথা বললে মনে করতাম ঠাট্টা করছেন।

[কয়েক মুহূর্তব্যাপী স্তব্ধতা]

তাহেরা - না, পীরসাহেব ঠাট্টা করছেন না। পীরসাহেব বুদ্ধিমান লোক। কেবল তিনি এবার অন্য এক ধরনের চাল চালছেন।

হাশেম - (ফেটে পড়ে) চাল, কী চাল?

তাহেরা - বুঝতে পারছেন না?

[আবার স্তব্ধতা]

হাশেম - আব্বা, বুঝেছি কিস্তিমাৎ করা চাল। যে কথা আপনিও বোঝেননি আমি বুঝিনি, সে কথা পীরসাহেব ঠিক অনুমান করেছেন। তিনি ঠিক বুঝেছেন যে তাঁর বিবি ঘর ছেড়ে পালাতে পারেন। যদিও জানেন না কোথায় যাবেন, কোথায় থাকবেন, এমনকি তিনি পানিতে পড়ে আত্মহত্যা করতে পর্যন্ত প্রস্তুত, কিন্তু একটি নির্দোষ পরিবারকে তিনি ধ্বংস হতে দিতে পারেন না, যদি সেই পরিবারকে রক্ষা করার একমাত্র চাবি তাঁরই হাতে তুলে দেওয়া যায়। কেবল তাঁরই জন্য একটি পরিবারকে তিনি উচ্ছন্নে যেতে দিতে পারেন না।

হাতেম আলি - এ কী আবার নতুন সমস্যা। নিজের অস্তিত্ব বাঁচানোর জন্য একটি লোক আরও কত রকমের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে।

হাশেম - (তাহেরার দিকে তাকিয়ে) আমাদের বাঁচানোর দায়িত্ব এখন আপনার। বড় কঠিন দায়িত্ব; এ দায়িত্ব রক্ষা করতে হলে যেখান থেকে প্রাণপণে ছুটে পালিয়েছেন, সেখানে এবার আপনাকে ফিরে যেতে হবে।

খোদেজা - খোদা, খোদা। কী দায়িত্ব, কী শর্ত?

হাশেম - (অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে) আর বুঝে কী হবে আম্মা। তবে আপনার ভয়ের কোনো কারণ নাই। এবার তিনি ফিরে যাবেন পীরসাহেবের খেদমত করার জন্য, পানিতে আর ঝাঁপ দিতে চাইবেন না, আপনার একমাত্র ছেলেরও মাথা খারাপ করবেন না। আপনি না চাইছিলেন এবার তাই হবে।

খোদেজা - হাশেম, হাশেম, অত অস্থির হস্‌ না, দ্যাখ আমার বুক ধড়ফড় করছে।

হাশেম - (মায়ের দিকে দাঁড়িয়ে) আপনি বুঝতে পারছেন না যে পীরসাহেব আমার মুখও বন্ধ করেছেন। আমি তাঁকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। কারও সমর্থন নাই, তবু ভাবছিলাম কিছু একটা করবই । কিন্তু এবার আমার মুখ বন্ধ হলো। আমিই একমাত্র তাঁর দলে ছিলাম, এবার তাঁর পক্ষ হয়ে আমার বলার কিছু থাকল না। আমি কী করে এবার বলি আপনি পালান, যাবেন না পীরসাহেবের সঙ্গে, মানবেন না তাঁর শর্ত, যাক আমার বাপের জমিদারি ধ্বংস হয়ে। আমার বাপের মনে যে সামান্য আশার সঞ্চার হয়েছে, এত গভীর নিরাশার মধ্যে সামান্য একটু যে—আলো দেখা দিয়েছে, সে আলোকে ধূলিসাৎ করে আপনি পীরসাহেবের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দিন। উনি নিশ্চয়ই তা করতে পারেন, কিন্তু আমি তাঁকে আর সে কথা বলতে পারি না।

খোদেজা - হাশেম, হাশেম, তুই একটু চুপ করে বস, হাশেম!

হাশেম - (তাহেরার সামনে দাঁড়িয়ে) কী করতে চান আপনি? শুনলেন তো শর্ত, জানেন তো কীভাবে বাঁচবে আমাদের জমিদারি।

তাহেরা - কী আর করব (একটু হেসে) যে লোক বৃদ্ধ হয়েও এত বুদ্ধিমান তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

খোদেজা - এই যে মেয়েটি হাসছে। তার মনে চিন্তা নাই, আর আমার ছেলেটি পাগলের মতো লাফালাফি চেঁচামেচি করছে।

হাশেম - (সে কথায় কান না দিয়ে তাহেরার দিকে চেয়ে) রহস্য করবেন না, পরিষ্কার করে বলুন, কী করতে চান?

তাহেরা - (গম্ভীর হয়ে) বলছি, বলছি। (যেন ভাবে, তারপর হঠাৎ ভেঙে পড়ে কাঁদতে শুরু করে। আবার কয়েক মুহূর্তব্যাপী নীরবতা।

হাশেম - আব্বা! দেখুন উনি কাঁদছেন।

তাহেরা - (সংযত হয়ে) না না এমনি কান্না এলো। আমি বলছি, এত চেঁচামেচি করলে কী করে বলি।

খোদেজা - হাশেম তুই চুপ করে থাক। এখানে তোর আব্বা আছেন, তিনি সব বোঝেন। কিছু বলতে হলে তিনিই বলবেন। (হঠাৎ বেঞ্চিতে বসে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকে।)

তাহেরা - পীরসাহেব যা চান তাই হবে। তাঁকে বলুন, আপনাকে টাকা দিলে তাঁর সঙ্গে আমি ফিরে যাবো। কিন্তু আগে তাঁকে টাকা দিতে হবে, তারপর আমি যাব।

হাতেম আলি - হাশেম কী করব? (হাশেম নীরব থাকে)

খোদেজা - হাশেমকে কেন জিজ্ঞাসা করছেন? ও বলার কে?

হাতেম আলি - একজন চেঁচামেচি করে আর একজন কাঁদে। আমি কিছু বুঝতে পারছি না। নিজেকে যেন কসাইর মতো মনে হচ্ছে। (হঠাৎ আত্মসংবরণ হারিয়ে) আমি আর কত পারি, বাবা। তোমরা যদি বুঝতে এত দিন কী দোজখ গেছে আমার ওপর দিয়ে, কী যাতনায় ভুগেছি একা একা, জমিদারি হারানো কী সহজ কথা।

তাহেরা - আপনি অমন করবেন না। পীরসাহেবকে গিয়ে বলুন, আমি শর্ত মেনে নিতে রাজি আছি। আর ভাববেন না এ বিষয়ে।

হাশেম - (আপন মনে) আশ্চর্য, শুধু কতগুলো টাকার ওপর এতগুলো জীবন নির্ভর করছে। হয় এটি ধ্বংস হবে, না হয় ওটি ধ্বংস হবে। আর, আর আমার কিছু বলার নেই। কিছুক্ষণ আগেও ছিল, এখন আর নাই।

খোদেজা - আমিই বলি। আমি অত প্যাঁচের ধার ধারি না। পীরসাহেব নেক মানুষ, তিনি ভালোই করতে চান। আমাদেরও, তাঁর বিবিরও। জমিদারি গেলে আমাদের সব যাবে, কিন্তু সে ফিরে গেলে তার কিছু ক্ষতি হবে না। বরঞ্চ সে মান, যশ, সুখ, সম্পত্তি সব পাবে। তিনি যদি না বাঁচান তবে কে তাঁকে বাঁচাবে? তিনি তাঁর জন্য যা করেছেন, তা কেউ কারও জন্য করেন না। মেয়েটা বোকা, তাই বোঝে না। দুঃখ হলো এই যে, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যেন বুদ্ধি হারিয়েছি। এতে এত ভাববার কী আছে?

হাশেম - (ব্যাঙ্গের সুরে) না না, ভাববার কী আছে, আমাদের ভাববার কিছুই নাই।

[এ কামরায় এরপর সবাই ভাবে]

বহিপীর - ঐ ঘরে একবার যে যায় সে আর সহজে ফিরতে চায় না। কী হইল জমিদার সাহেবের? (থেমে) হকিকুল্লাহ্, হয়তো তোমাকে একটু বাহির হইতে হইবে। রাতেই তাহাদের বলিয়া রাখা সমীচীন হইবে, সময় তো বেশি নাই।

হকিকুল্লাহ্ - জি হুজুর!

বহিপীর - পাশের ঘরে কোনো আওয়াজ নাই। সকলে মিলিয়া কী করিতেছে? গোপনে-গোপনে শলাপরামর্শ আঁটিতেছে না তো? কী মতলব তাহাদের?

হকিকুল্লাহ্ - হুজুর, কী করে বলব কার মনে কী?

বহিপীর - (রেগে) তুমি তো কখনোই বলিতে পারো না। অপরের মাথায় সুড়ঙ্গ কাটিয়া প্রবেশ না করিলে যেন মনের কথা জানা যায় না। তওবা, তওবা পিট জোরে টিপ।

তাহেরা - (জেগে উঠে) সত্যিই আর ভাববার কিছু নাই। যান, পীরসাহেবকে গিয়ে বলুন, আমি রাজি আছি।

হাতেম আলি - (খোদেজার দিকে তাকিয়ে) আপনি কী বলেন?

খোদেজা - আমি তো বলেছি। মেয়েটি বুঝতে পারছে না যে পীরসাহেব তার ভালোর জন্যই এত সব করছেন। যে রাস্তার মেয়েলোকের মতো ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায় তার ভালোর জন্যই তিনি যে এতটা করেছেন, তা বড় জোর-কপালের কথা। অন্য কেউ হলে এমন মেয়ের জন্য এক পাও নড়ত না। তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে ভালোভাবে খেয়ে-পরে সে সুখে-শান্তিতেই থাকবে। তা ছাড়া, পীরের ছায়ায় বাস করার সৌভাগ্য ক'জনের হয়? পীরসাহেব একটা চাল যদি চেলেই থাকেন তবে সেটা সকলের ভালোর জন্যই চেলেছেন। নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি এই তো বুঝি।

তাহেরা - জমিদার সাহেব, তিনি ঠিকই বলছেন। যান, ভাববেন না।

হাশেম - (চিৎকার করে) আব্বা!

হাতেম আলি - (চমকে) কী বাবা?

হাশেম - (সুর বদলে) না, কিছু না। তিনি যা বলছেন তাই করুন।

বহিপীর - (দরজার দিকে তাকিয়ে) কী হইল তাঁহার? জমিদার সাহেব কিছু আসিয়া বলিবেন তো! (খাট্টা মেজাজে) বহুৎ হইয়াছে, হকিকুল্লাহ, আর নয়। বলিলাম টিপিতে, তুমি কিনা আমার শরীরটা ভর্তা বানাইয়া দিলে। ময়দা নাকি আমার শরীরটা?

হাতেম আলি - (তাহেরার দিকে তাকিয়ে লজ্জিতভাবে) আর কিছু বলবেন না?

তাহেরা - (মাথা নাড়ে)

খোদেজা - তার কথা যে বলেছে। আপনি যান, গিয়ে বলুন যে রাজি আছে।

হাতেম আলি - (হাশেমের দিকে তাকিয়ে) কী বাবা, উঠতে পারছি না কেন? চক্ষুলজ্জা নাকি?

হাশেম - লজ্জা করে কী হবে, আব্বা? তা ছাড়া করার যখন আর কিছুই নাই তখন চক্ষুলজ্জা অর্থহীন। আমরা যদি দোষী হয়েই থাকি, তবে সে দোষ চক্ষুলজ্জায় ঢাকবে না, বরঞ্চ তাতে দোষটা খুঁচিয়ে বের করে দেখানো হবে।

হাতেম আলি - (দৃঢ়চিত্তে উঠে পড়ে) আচ্ছা যাই। কিন্তু বলুন, আপনি অসুখী হবেন না তো?

তাহেরা - না, অসুখী কেন হব?

হাশেম - (রেগে অসংযত হয়ে) আমাদের মুখে চুনকালি দিয়েছেন। সেটা হজম করেছি আবার মিথ্যা কথা বলে সে চুনকালি রগড়াচ্ছেন কেন?

খোদেজা - হাশেম!

হাশেম - চেঁচান, চেঁচান। এবার জমিদারি তো ফিরে পেয়েছি, আসুন সবাই চেঁচাই। [হাতেম আলি উঠে পাশের ঘরে যান। দরজা আধা-খুলে হাশেম দাঁড়িয়ে থাকে।]

বহিপীর - কী খবর জমিদার সাহেব?

হাতেম আলি - তিনি যাবেন।

বহিপীর - শোকর আলহামদুলিল্লাহ্। হকিকুল্লাহ্, হকিকুল্লাহ্!

হাতেম আলি - (বাধা দিয়ে) কিন্তু একটা কথা আছে। তিনি রাজি আছেন আমি রাজি নই। আমি এভাবে টাকা নিতে পারব না। যায় যাক জমিদারি।

বহিপীর - ভাবিয়া কথা বলিতেছেন কি?

হাতেম আলি - অনেক তো ভেবেছি এ কদিন ভাবতে ভাবতে শরীরে আর কিছু নাই। কিন্তু হঠাৎ সব ভয় ভাবনা কেটে গেছে, আরও মনে হচ্ছে, নতুন এক জীবনের স্বাদ পেয়েছি।

হাশেম - (চেঁচিয়ে) আব্বা! (এগিয়ে আসে)

বহিপীর - ভালো ভালো। যেমন বোঝেন। আমার আর কিছু বলিবার নাই।

খোদেজা - (লাফিয়ে দরজার কাছে এসে) কী বললেন পীরসাহেবকে?

হাতেম আলি - (হেসে) বললাম, তিনি রাজি আছেন কিন্তু এভাবে আমি টাকা চাই না, যাক জমিদারি।
[খোদেজা থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।]

বহিপীর - (ঘন ঘন মাথা নেড়ে) হুঁ, বেশ বলিয়াছেন, উত্তম কথা বলিয়াছেন। হুঁ। উত্তম কথা, অতি উত্তম কথা।

খোদেজা - (চেঁচিয়ে) পীরসাহেব, আমাদের ওপর রাগ করবেন না; আমাদের বদ্‌দোয়া দেবেন না।

বহিপীর - (হঠাৎ রেগে উঠে) আমাকে আপনারা কী ভাবিয়াছেন, আমি পীর হইয়াছি বলিয়া কি মনুষ্য নই? ভাবিতেছেন, আপনারাই সব একেক জন দয়ার সাগর আর আমি একটি হৃদয়হীন পশু, বেদরদ বেশরম জল্লাদ? জমিদার সাহেব বিনা শর্তে আপনি টাকা পাইবেন। ইহা দান নয়, ইহা পীরি বদন্যতাও নয়। আপনাকে ইহা লইতেই হইবে। আমার বিশেষ অনুরোধ।

হাতেম আলি - পীরসাহেব? কী বলছেন আপনি?

খোদেজা - খোদা, খোদা!

বহিপীর - অবাক হইবেন না। অবাক হইবার কিছু নাই। তবে একটা কথা। আমার বিবি সম্বন্ধে যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। সে বিষয়ে আমার কোনো ভুল হয় নাই। কিন্তু জমিদার সাহেবের ব্যাপারে আমি নেহাতই ভুল করিয়াছি। অতি আশ্চর্য, সে বিষয়ে সত্যিই নিঃসন্দেহ ছিলাম। এত নিঃসন্দেহ ছিলাম যে, তিনি প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তাহা এক মুহূর্তের জন্য খেয়াল হয় নাই। আমাকে ভুল মানিতেই হইবে। আর এ কথাও মানিতে হইবে যে, কোনো মানুষ হঠাৎ আশাতীত কাজ করিয়া বসিতে পারে।

হাতেম আলি - পীরসাহেব, এমন কথা বলবেন না।

বহিপীর - না বলিয়া উপায় কী, কিন্তু ইহা প্রলাপ বকার মতো। চিন্তা করিবেন না, টাকা আপনি পাইবেনই।

হাশেম - (হঠাৎ ধৈর্যহারা হয়ে) না, পীরসাহেব, টাকা আমাদের চাই না।

খোদেজা - হাশেম!

হাশেম - (হাতেম আলির দিকে চেয়ে) আব্বা বলে দিন পীরসাহেবকে, বলে দিন যে সত্যই আমরা টাকা চাই না।

২০১৮

খোদেজা - হাশেম, হাশেম।

বহিপীর - (অবাক হয়ে) এখন বাবা কী? আমার আর কোনো শর্ত নাই। সকলে মিলিয়া আমাকে অমানুষে পরিণত করিয়াছেন। জমিদার সাহেবের উপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা ছিল যে তিনি আমার দলে থাকিবেনই, কিন্তু তিনিও আমাকে ঠকাইলেন। আর কিছু না থাকিলেও আমার জোব্বার সম্মান তো দিবেন? না, ইহা আপনাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। মনে করিবেন, ইহা পরাজিত শত্রুর শেষ দাবি। এ দাবি কবুল করিতেই হয়।

তাহেরা - (উচ্চ ধীর কণ্ঠে) দেখুন, আমি একবার যে কথা বলেছি সে কথার ব্যতিক্রম হবে না। আমি যাব।

হাশেম - (চেঁচিয়ে) কী বলেছেন আপনি?

খোদেজা - হাশেম!

তাহেরা - (দৃঢ় কণ্ঠে) আমি যাবই!

হাশেম - (পূর্ববৎ) বুঝতে পারছি, সবার বদান্যতার পরীক্ষা চলছে, বদান্যতার জোরে জান যায় মানুষের; তার নেশায় অন্ধ হয়।, বুদ্ধি-বিবেচনার শক্তিও হারায়। আপনি ভুল করবেন না। আপনার সত্য পণ এটা নয়। না, আপনাকে নেশায় ধরেছে। আপনি জানেন না যে, এঁরা আপনার জীবন নিয়ে খেলা করছেন। আপনি যেন দাবার গুঁটি, জীবন নিয়ে খেলা করছেন, বুঝতে পারছেন না সে কথা? না, না, আপনাকে আমি বাঁচাবই। (দ্রুতপায়ে তাহেরার পাশে এসে) চলুন আমার সঙ্গে, চলুন আমরা পালাই; এ বদান্যতা হঠাৎ আপনার কাছে মধুর মতো ঠেকছে; বুঝতে পারছেন না যে, এ বিষ! (হাত ধরে বাইরে দরজার দিকে নিয়ে যেতে যেতে) আপনাকে নিয়ে যাবই। বলে দিলাম,আপনাকে বাঁচাব। আপনাকে বাঁচাবার সময় আমার হয়েছে। এখন আপনাকে আর ছেড়ে দিতে পারি না।

তাহেরা - (বিস্ময়ে) একি কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে?

হাশেম - কথা বলবেন না। (বেরিয়ে যায়)

খোদেজা - (হাতেম আলিকে) কী করছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। থামান তাদের? থামান আমার ছেলেকে?

হাতেম আলি - হাশেম! (দ্রুতগতিতে উঠে দরজার দিকে রওনা হতেই বহিপীর তার হাত ধরে ফেলেন, আর ইশারায় খোদেজাকে ধৈর্য ধরতে বলেন।)

খোদেজা - পীরসাহেব।

বহিপীর - ধৈর্য ধরুন, ধৈর্য ধরুন।

[ততক্ষণে হাশেম তাহেরাকে হাত ধরে তীরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তাহেরার চলাটা ইচ্ছাকৃত না হলেও সে বিশেষ বাধা দেয় না। কেবল বলতে থাকে, কোথায় যাব? কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে? এ ঘরে বহিপীর ব্যতীত আর সবাই বিমূঢ় হয়ে থাকে।]

বহিপীর - (দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে) এতক্ষণে ঝড় থামিল। তাহারা গিয়াছে, যাক। তা ছাড়া তো আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে যাইতেছে না। তাহারা তাহাদের নতুন জীবনের পথে যাইতেছে। আমরা কী করিয়া তাহাদের ঠেকাই। আজ না হয় কাল, যাইবেই।

খোদেজা - (অধীর কণ্ঠে) পীরসাহেব! কী হবে আমাদের?

বহিপীর - (হেসে) তওবা তওবা। এত বিচলিত হইবার কী আছে? আমরা সকলে তো রহিলাম। আমরা থাকিব; আপনার জামিদারিও থাকিবে; আমরা আমাদের পুরাতন দুনিয়ার মধ্যে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাকি দিন কাটাইয়া দিব। চিন্তার কী কারণ?

খোদেজা - (হঠাৎ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে) পীরসাহেব!

বহিপীর - (দেদার হেসে) আপনি এইবার আমাকে বদ্‌দোয়া দিতেছেন। কিন্তু পীরের ঐ এক সুবিধা। কোন বদ্‌দোয়া পীরের গায়ে লাগে না। আসুন জমিদার সাহেব, আমরা আপনার জমিদারি রক্ষার ব্যবস্থা করি। হকিকুল্লাহ্‌!

[যবনিকা]

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। এমন ঝড় কখনো দেখিনি– উক্তিটি কার?

ক. হাশেমের   খ. তাহেরার

গ. খোদেজার   ঘ. বহিপীরের

২। ‘এক-আধটু ঠাট্টা-মস্করা করতেও শুরু করেছে’ –কারা এ কাজটি করতে শুরু করেছে?

ক. মাঝিরা   খ. সহপাঠীরা

গ. গ্রামের লোকেরা   ঘ. যাত্রীরা

৩। নদীতে খালি কী দেখতে পায় তাহেরা?

ক. নৌকা   খ. বজরা

গ. পদ্ম পলাশ   ঘ. কচুরিপানা

৪। কথ্য ভাষা সম্পর্কে বহিপীরের মত হলো, – এটি

i. মাঠ ঘাটের ভাষা

ii. স্রষ্টার বাণী বহন করার উপযুক্ত

iii. খোদার বাণী বহন করার অনুপযুক্ত

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক. i   খ. ii

গ. i ও ii   ঘ. i ও iii

২০১৯

উদ্দীপকটি পড়ে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

তামশু মহাজনের জামি বেদখল হয়ে যাচ্ছে। সে কারণে তাঁর মনে শান্তি নেই। বাড়িতে না জানিয়ে তিনি জমি রক্ষার জন্য কোর্টে যান। এসব খরচ জোগানোর অর্থ জোগাড়ের জন্য তিনি বিপথ অবলম্বন করতে গিয়ে বোধোদয় হয়।

৫। উদ্দীপকের তামশু মহাজনের সাথে বহিপীর নাটকের যে চরিত্রটি সাদৃশ্যপূর্ণ–

ক. হকিকুল্লাহ্ খ. হাশেম আলি

গ. হাতেম আলি ঘ. জমিদার গিন্নি

৬। কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে উভয় চরিত্র সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. জমিদারিত্ব রক্ষার জন্য কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন।

খ. পীর সাহেবের প্রতারণার শিকার।

গ. সন্তান হারানোর জন্য কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন

ঘ. বজরায় দুর্ঘটনার শিকার।

উদ্দীপকটি পড়ে ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মাতবর ধূর্তপ্রকৃতির লোক। বয়স হয়েছে অথচ স্বভাব বদলায়নি। বুড়ো বয়সে কলিমুদ্দির মেয়েকে বিয়ে করার ব্যবস্থা করে। কিন্তু মেয়েটি বিয়ের রাতেই রাজেনের সাথে পালালে মাতবর তা মেনে নেয়।

৭। উদ্দীপকের শেষ অবস্থা মোকাবিলার মাধ্যমে বহিপীর নাটকের কোন চরিত্রের মিল আছে?

ক. বহিপীর খ. হাশেম আলি

গ. হাতেম আলি ঘ. হকিকুল্লাহ্

৮। শেষ অবস্থার মোকাবিলায় উভয় চরিত্রে যে বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে তা হলো–

i. বুদ্ধিমত্তা

ii. বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন

iii. মানবিক চেতনা

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আব্দুল্লাহ গ্রামের স্কুলে মাস্টারি করেন। গ্রামের মানুষ তাকেও পীর মনে করেন। কারণ, তাঁর বাবাও পীর ছিলেন। সে কারণে গ্রামের একজন বয়স্ক লোক তাঁর পায়ে সালাম করতে যান। কিন্তু আব্দুল্লাহ্ এসবে বিশ্বাস করেন না। সে জন্য তিনি সালাম করতে না দিলে বয়স্ক লোক মনে করে বেহেস্তের চাবিটা একটুর জন্য ফস্‌কে গেল।

৯। উদ্দীপকের আব্দুল্লাহের কার্যক্রমে 'বহিপীর' নাটকের বিপরীত বৈশিষ্ট্যের চরিত্রটি হলো–

ক. হাশেম আলি খ. হাতেম আলি

গ. হকিকুল্লাহ্ ঘ. বহিপীর

১০। বহিপীর নাটকের বিপরীতে কার্যক্রমে আব্দুল্লাহ্ চরিত্রে প্রকাশিত দিকটি হলো –

ক. ধূর্ততা খ. ধৈর্যশীলতা

গ. কুসংস্কারমুক্ত ঘ. ভণ্ডামি

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। আজাদের বাবা নামকরা পীর ছিলেন। কিন্তু আজাদ লেখাপড়া শিখেছেন। শহরে চাকরি করেন। দীর্ঘদিন পর গ্রামে বেড়াতে আসেন। গ্রামের মুরব্বি তার কাছে এসে তাকে সালাম করতে যায়। আজাদ সাহেব নিজেই তাকে সালাম করেন, কিন্তু মুরব্বি এ ঘটনায় নিজেকে পাপী মনে করেন। আরেকজন তার কাছে পানি পড়া নিতে আসে। তাকে আজাদ সাহেব বোঝানোর চেষ্টা করেন।

ক. বহিপীর নাটকের ১ম সংলাপটি কার?

খ. বিয়ে হলো তকদিরের কথা– এ কথাটি বুঝিয়ে বলো।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত গ্রামের মানুষগুলোর কার্যক্রমে 'বহিপীর' নাটকে প্রতিফলিত সমাজের কোন চিত্রকে ইঙ্গিত করে তা তুলে ধরো।

ঘ. উদ্দীপকের আজাদ চরিত্রটি 'বহিপীর' নাটকের বহিপীরের মতো ধর্মব্যবসায়ী নয়–মন্তব্যটি বিচার করো।

২। মঞ্জুর সাহেবের ভগ্নিপতি মারা যাওয়ার পর ভগিনী মাজেদাকে নিয়ে এসে মানুষ করে। টাকা বাঁচানোর জন্য মাজেদাকে ব্যবসায়ীর দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। মঞ্জুর সাহেবের স্ত্রী এর প্রতিবাদ করে এবং তা হতে দেয়নি।

ক. সূর্যাস্ত আইন কত সালে প্রণীত হয়?

খ. জমিদার হাতেম আলির মনে শান্তি নেই কেন?

গ. উদ্দীপকের মঞ্জুর সাহেবের সাথে 'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলি চরিত্রের বৈসাদৃশ্য তুলে ধরো।

ঘ. মাতৃসুলভ সহানুভূতি থাকলেও উদ্দীপকের মাজেদা চরিত্রটি পুরোপুরি 'বহিপীর' নাটকের খোদেজা চরিত্র নয়– মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো।

৩। সুমির বাবা দিনমজুর। যৌতুকের টাকার অভাবে সুমির বাবা বৃদ্ধ মোড়লের সাথে তার বিয়ে ঠিক করে। সুমি রাজি না হয়ে কর্মের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে গেলে সবাই মিলে তাকে ধরে জোর করে বিয়ে দিতে চায়। তখন রাহুল প্রতিবাদ করে এ বিয়ে ঠেকায়। অবশেষে সে নিজেই বিনা যৌতুকে তাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়।

ক. নৌকার সঙ্গে কিসের ধাক্কা লেগেছিল?

খ. এমন মেয়েও কারও পেটে জন্মায় জানতাম না– এ কথাটি বুঝিয়ে বলো।

গ. উদ্দীপকের সুমি চরিত্রটি 'বহিপীর' নাটকের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ– তা তুলে ধরো।

ঘ. প্রতিবাদের প্রতীক চরিত্র হিসেবে উদ্দীপকের রাহুল ও 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলি অভিন্ন– মূল্যায়ন করো।

সমাপ্ত

২০১৯

২০১৯
শিক্ষাবর্ষ
৯ম-১০ম সহপাঠ

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বই পড়তে যে ভালোবাসে তার শত্রু কম

– চার্লস ল্যাম্ব

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য